সুকুমার ঘোষ

ডল পুতুলের সন্ধানে



মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

DOLL PUTULER SANDHANE

ডলপুতুলের সন্ধানে

প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ই শ্রাবণ, ১৩৮৯

প্রকাশক
শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও ছবি
সুনীল চক্রবর্তী

মুদ্রক
শ্রী এস. কে. নন্দী
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড
৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

বারো টাকা

(খোলাবাজারের কাগজে ছাপা)

রাজু—কে

সে আর এক আজব দেশে
গিয়ে আর ফেরে নি

এই লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা

অষ্টক

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে

না সুখ না দুঃখ তবু

অনুবাদ

সেফেরিসের কবিতা

মুখবন্ধ

বলাই বাহুল্য, এ-মুখবন্ধ বাচ্চাদের জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে, বাচ্চাদের জন্যে নয়। বাচ্চারা এটা ডিঙিয়ে চলে যাবে আসল গল্পে।

এ-অঞ্চলে আমি নবাগত, কিন্তু পথ প্রাচীন। বাংলাভাষায় আবোলতাবোলের রাজ্যের শেষ কীর্তিমান পুরুষ নিঃসন্দেহে সুকুমার রায়। পরে অনেকেই হেঁটেছেন এ-পথে, তবে চোখ বুঁজে ; এবং হুঁচোট খেয়েও চোখ খোলেননি। ফলে, নতুন পারিপার্শ্বের দিকে তাকানো বিস্মিত বাল্যকালের খবর যা মিলেছে, তাকে অকিঞ্চিৎকরই বলা যায়। এই ব্যক্তিগত লোভই আমার এ-বই রচনার প্রথম কৈফিয়ৎ।

বাল্যে ও কৈশোরে যে বইগুলি পড়েছিলাম সেগুলির স্মৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। প্রথমেই মনে পড়ে লুইস ক্যারোলের 'অ্যালিস ইন দি ওয়াণ্ডার্ল্যাণ্ডে'-র কথা। ক্যারোল-এর সমকালীন এডোয়ার্ড লীয়র আর এক মৌচাক বেঁধেছিলেন। লীয়রী ননসেন্স (আবোলতাবোলই সঠিক বাংলা, কিন্তু এটা সুকুমার রায়ের ট্রেডমার্ক, তাই 'ননসেন্সে'ই তুষ্ট থাকব আপাতত) এক প্রকৃতি-নকলনবীশের সব্য রচনা, ঠিক 'অ্যালিস' যেমন এক গণিতজ্ঞের সাময়িক ঘটনার নৈশবিলাস।

এই সঙ্গে আমার মাথায় রয়েছেন 'যেদিকে তাকাই তিনি' রবীন্দ্রনাথ। আমার আদর্শ অবশ্য 'খাপছাড়া'-রচয়িতা—যাঁর গ্লিসারিন-সোপ-প্রার্থী বাঘ গ্রামত্যাগী শহরমুখীদের একজন। ছেলেভোলানো রঙ্গের সঙ্গে বুড়োভোলানো ব্যঙ্গের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে দ্বিজেন্দ্রলালে, কিন্তু তাঁর কান ছন্দের চেয়ে সুরের দিকেই পক্ষপাত দেখিয়েছে বেশি। এ-রাজ্যের চিরযুবরাজ সুকুমার রায়। তাঁর অকালপ্রয়াণ শোকাবহ বটে, তবে ক্ষোভ করবো না। কারণ, একজন স্রষ্টার যুগান্তকারী অবদান, এ-পর্যন্ত যা দেখেছি, একটি বা দুটি।

আমার এ বইটি যে গোত্রবিহীন নয় উপরের উত্তমর্ণরাই তার সাক্ষী। তবে সর্বাধিক ঋণী আমি আমার আবাল্য পরিবেশের মানুষজন এবং কল্পবৃক্ষ মাতৃভাষার কাছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, 'ভিক্ষাভাবে'র সঙ্গে 'শিককাবাবে'র মিলটি শিবরাম চক্রবর্তীর অপেক্ষাকৃত সুন্দর 'শিক্ষাভাব' ও 'শিককাবাব' অনুপ্রাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

বইটির রচনায় আমার স্ত্রী শ্রীমতী ইলা ঘোষ ও পুত্র শ্রীমান গৌতমের অক্লান্ত সহযোগ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। প্রাক্-প্রকাশনাপর্বে যাঁরা সহায়তা করেছেন সেইসব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে বারিদবরণ রায় ও নিমাই সাহার মুখ্য ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশ করতে মডার্ণ বুক এজেন্সী-র কর্তৃপক্ষ যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দেখিয়েছেন তা তাঁদের দুঃসাহসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এই দুঃসাহস তাঁরা দেখিয়েছেন এক নতুন লেখকের বই প্রকাশের মতো অব্যবসায়িক উদ্যোগ নিয়ে।

এত কথার পরও জানি বাচ্চাদের জ্যাঠামশায়ের মুখ বন্ধ করা যাবে না। গোটা বইটা পড়ে যদি তাঁরা নাক কুঁচকে বলেন 'ননসেন্স', তবে বুঝবো আমার শ্রম সার্থক, কারণ আমারও উদ্দেশ্য একই।

সুকুমার ঘোষ
১০ই শ্রাবণ ১৩৮৯

ডলপুতুলের সন্ধানে

সুকুমার ঘোষ



গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে রাজুর আর কিছুতেই সময় কাটছিল না। সময় কাটবেই বা কী করে। পাশের বাড়ির বুকু ভিলভিলি মামাবাড়ি গেছে আম খেতে। নন্দকাকারও মাটির পুতুল গড়ে দেবার ফুরসত হচ্ছে না একদম। যাত্রাগানের পার্ট মুখস্থ করায় ব্যস্ত যে। কিন্তু সেই যাত্রা হবে কবে, না, রাজুর ছুটি যখন ফুরিয়ে যাবে। আবার ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে এই দুপুর বেলাটায়। কোথাও বেরোতে দেবে না মা। খালি ঘুম পাড়াবে।

সকাল থেকেই আজ সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে রাজুর। বারবার বলা সত্ত্বেও মা ফেনাভাতে বড়িসেদ্ধ দেয়নি। বলে শেলেস্‌সা হবে। দুপুরে খাবার আগে দু-দুবার আমবাগানে ঘুরে এসেছে রাজু, একটাও আম পায়নি। উল্টে, লাল পিঁপড়ের কামড় খেয়ে এসেছে হাঁটুর কাছে। জায়গাটা ফুলে আছে। যন্ত্রণা হলেও মাকে বলা যায়নি। মা বলবে—আগানে বাগানে যাস কেন?

খেয়ে পুকুরঘাটে মুখ ধুয়ে আসতেই রাজু দেখল পিয়ন একটা পার্শেল দিয়ে গেল। আসার সময় বাবাকে কমলা রঙের জুতোর কথা বলে এসেছিল। নিশ্চয়ই জুতো পাঠিয়েছে বাবা। খুলতে তর সয় না এক সেকেণ্ড। কিন্তু শেষে এ কী, হিলতোলা কালো জুতো? টান মেরে জুতোজোড়া তো ছুঁড়ে দিলই পুকুরে, ডলপুতুলটাও ছুঁড়ে ফেলল সেই সঙ্গে রাগ করে।

বাড়িতে পুরুষমানুষ বলতে নন্দকাকা। সেও এখন বাড়ি নেই, ফিরতে দুটো আড়াইটে হবে। কাজেই, জুতোজোড়া ফুলে ঢোল হয়ে ডুবে গেল। আর পুতুলটা ভাসতে ভাসতে ঘাটের উল্টো পারের কিনারায় কলমিদামের ভেতর গিয়ে আটকে রইল।

রাগ পড়ে গেলে, পুতুলটার জন্যে রাজুর বড় কষ্ট হল। এতক্ষণ জলের মধ্যে আছে, যদি সর্দি লেগে যায় বেচারার? আহা অবোলা জাত, কথা বলতে পারে না বলেই তো?

মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে মেয়ের মা-ই ঘুমিয়ে পড়ল। রোজ এরকমই হয়।

রাজু আস্তে আস্তে উঠে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর এক ছুটে পুকুরের ওই পারে গিয়ে, পাড় ধরে জলের কিনারে নামল। উবু হয়ে বেশ খানিকটা জলের উপর ঝুঁকে পুতুলটা যেই তুলতে যাবে অমনি নরম মাটি হড়কে গেল পায়ের তলা থেকে। ঝুপ করে শব্দ হল একটা।

দুই

চোখ খুলতেই বুড়ি বলল, 'আয় সোনা আয়। তোর জন্যে কবে থেকে পথ চেয়ে আছি!' বলেই বুড়ি মিটিমিটি হাসতে লাগল। শণের নুড়ির মতো চুল। ফোকলা দাঁতে খলবল করছে হাসি। এমন দেখলে অন্য সময় রাজুর গা জ্বলে যায়। কিন্তু এই নির্বান্ধব জায়গায় কেউ যে তাকে আদর করে ডাকছে, এতেই মনটা নরম হয়ে গেছে।

নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'হ্যাঁ গো ঠাকমা।'

'ঠাকমা' ডাক শুনে বুড়ি তো খুব খুশি। ফোকলা দাঁত আরো বের করে বলল, 'কতদিন তোর পা দুটো দেখেছি। আহা মল কিনে দেয়নি কেন কেউ?'

পায়ে মলের কথা রাজু অনেক গল্পে শুনেছে। ঝমঝম করে মল বাজিয়ে রাজকন্যা যায়। শুনেছেই শুধু, সত্যিকারের মল দেখেনি কখনো। মাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'মল দেখতে কী রকম মা?' 'এই এক রকম নূপুরের মতো জিনিস আর কী। ঝমঝম করে বাজে চলতে ফিরতে।' এর বেশি আর জানতে পায়নি। ইচ্ছে করছিল বুড়ির কাছ থেকে জেনে নেয়, কিন্তু বুড়ি শুধু ঠ্যাং দেখেছে বলায় কেমন খটকা লাগল।

'কেন, শুধু ঠ্যাং কেন?' পাল্টা শুধোয় রাজু। 'আমি তো চানও করতাম। ডুব দিতাম ভুস ভুস করে।'

'তা হবে', বুড়ি বলল, 'ডুব দেবার সময় যে তুই চোখ বুঁজে ফেলতিস রে।'

'আমি চোখ বুঁজে ফেললে তোমার কী? তোমার চোখ দুটো তো খোলা থাকত। নাকি, তুমিও চোখ বুঁজে ফেলতে তখন।'

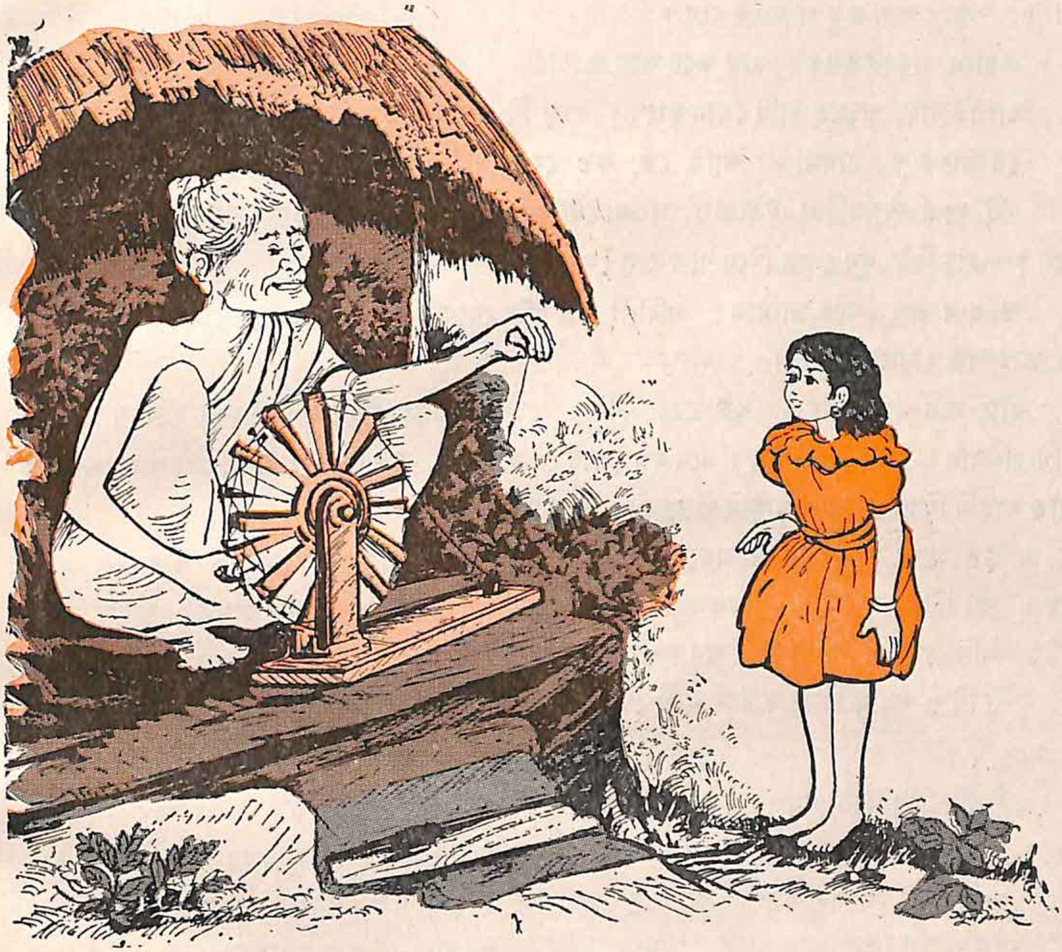
'আমার কি আর চোখ বোঁজবার জো আছে ভাই' বলে বুড়ি একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ে।

'কেন?'—রাজুর জেরা চলতে থাকে।

'এই দ্যাখ, অত প্রশ্ন করিসনে বাছা। এখানে ওই নিয়ম। তুই যদি চোখ বুঁজে ফেলিস তো তোকে কে দেখবে বল? আর যদি কানে আঙুল দিস তো কারো সাধ্য নেই তোর কথা শোনে।'

'তাই বুঝি'—ভাবতে চেষ্টা করল রাজু, ভুরু কুঁচকে, কোমরে হাত রেখে, তিনটে আঙুল দিয়ে গাল চেপে। কিন্তু কিছুতেই ভাবনাটা জমছে না। ঘাটের রানায় বসে জলে পা খলবল না করলে, কি বইয়ের পাতার কোনা মোড়াতে না পারলে রাজুর ভাবনা আসে না। তখন খালি কী খাব কী খাব করে মন। এখন তা-ও মনে হচ্ছে না। বাবা বলে, পড়ায় মন বসালে নাকি খিদে তেষ্টা ভুল হয়ে যায়। আমিও সেইরকম পড়ুয়া হয়ে গেলাম নাকি?

'চল তোকে মোয়া খাওয়াবো।'—বুড়ির এই ডাক শুনেই পেটে খিদে চনমন করে উঠল। রাজু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অমন পড়ুয়া হওয়ার দরকার নেই বাবা।



বুড়ির পেছন পেছন চলল। চলতে চলতে পড়ল একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। সাঁকো মানে দুপাশে দুজোড়া ঢ্যাড়া কাটার মতো বাঁশ পোঁতা আর তার ওপরে দুখানা বাঁশ ফেলা আছে। ধরার কিছু নেই দুপাশে। খালের ওপারেই ছোট একখানা বাড়ি। খুব সাজানো গোছানো। ছবির বইয়ে এইরকম বাড়ি দেখা যায়। খুব পছন্দ হচ্ছে রাজুর।

'তুমি ওইখানে থাকো, না ঠাকমা?'

বুড়ি এমনভাবে ঘাড় নাড়ে, তাতে হ্যাঁ-ও হয় আবার না-ও হয়।

পার হতে রাজুর ভয় ভয় করছিল। যদি পড়ে যাই? বাব্বা কতখানি গভীর!

বুড়ি দাঁত বের করে বলল, 'বল, পার হচ্ছি।' খুব বাধ্য মেয়ের মত 'পার হচ্ছি' বলল রাজু। 'আচ্ছা এবার পেছন পেছন চলে আয়। এখানে তুই হাজার চেষ্টা করেও যেটা বলবি তার উল্টো করতে পারবি নে।'

রাজুর ভাবনা হল বড়। ভূগোল বই খুলে পিসিদের বাগানের ডাঁশা পেয়ারার কথা ভাবা যাবে না ? পড়তে বসে শুধু পড়তেই হবে ?

'এখানে পড়তে হয় ?' রাজু ভয়ে ভয়ে শুধোয়।

'বালাই ষাট, পড়তে যাবি কোন দুঃখে ? পড়ে কি শেষে হাড়গোড় ভাঙবি ?'

'সে অন্য পড়া, ঠাকমা। আমি তো কত মোটামোটা বই পড়ি। বাবা পড়ে তার চেয়েও মোটা। এই ধরো আমেরিকা, ইউরোপ, লণ্ডন, টোকিও প্রভৃতি জায়গার কথা তুমি না পড়লে জানবে কী করে ?—প্রভৃতিটা খুব জোর দিয়ে বলে রাজু বোঝাতে চাইল সে কত জানে।

'তা হবে বাপু, অত জানিনে। অবিশ্যি অল্প উঁচু থেকে যদি পড়ো, আর পড়ে যদি হাত পা না ভাঙে, তবে পদ্য বানাতে পারো।'

রাজু মনে মনে ভাবল, এই তো কদিন আগে খেলতে খেলতে অন্যমনস্ক হয়ে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজুর মনে হল পেটে খোঁচাচ্ছে কী যেন। কই আমি তো একরাশ পাকা পেয়ারাও খাইনি কিম্বা খেজুরও খাইনি গুচ্ছের। তা হলে ?

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই রাজুর নজরে এল তার নতুন জুতোজোড়া। পরিপাটি করে কে গুছিয়ে রেখেছে। কী নিকোনো গোছানো ঝকঝকে তকতকে উঠোন। পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়লে তাদের বাড়ি ঠিক এমনি দেখায়। দাওয়ার কোনায় একটা চরকা রয়েছে।

বুড়ি গিয়ে অমনি চরকা কাটতে বসে গেল। রাজুর এতক্ষণে চৈতন্য হল 'ও ঠাকমা, তুমি না চাঁদের মা বুড়ি ?'

বুড়ি মিটকি মিটকি হাসল। ওঃ এই হাসিটা রাজু কতবারই না দেখেছে ! কিছুক্ষণ পাশে চুপ করে বসে থেকে বুড়িকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'আমার ডলপুতুলটা দেখেছ ঠাকমা ?'

'দেখব কি, আমার বলে মরবার ফুরসত নেই। তুই বরং গুড়গুড়িমশাইকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।' বুড়ি আরো বিতং করে বলল, 'অনেক প্রাচীন লোক তো। কত দেখেছেন শুনেছেন।'

'তাঁকে কোথায় পাব ?'

'এই ত ওদিক পানে। একটু এগিয়ে যেখানে দেখবি একটা লাঠি খাড়া হয়ে আছে আর তার ডগায় থুতনি রাখা মুণ্ডুটা সব সময় এপাশ ওপাশ করছে। অমনি বুঝবি উনিই গুড়গুড়িমশাই।'

আর তর সয় না রাজুর। তিন লাফে উঠোন পার হয়ে সে রাস্তায় নেমে পড়ল। নেমেই মনে হল, মোয়া খাওয়া হল না তো। আর খাবেই বা কী করে ? পেটের মধ্যে কী যেন ভুস ভুস করছে। বুঝতে পেরেছি, রাজু মনে মনে বলল, পদ্য গিজ গিজ করছে আমার পেটের মধ্যে। পড়ে গিয়ে যখন আমার ঠ্যাং মচকায়নি, কি মাথা ফাটেনি, তখন এটাই হবে। ঠাকমাও তো তাই বলেছে।

চলতে চলতেই রাজুর মনে হল, ধরো একটা পিঁপড়ের সঙ্গে দেখা হল। লোকে তো বলে ওরা খুব কাজের লোক। কিন্তু আমার তো বাপু মনে হয় ওদের মতো অমন আলসে আর দুটি নেই ভূ-ভারতে। কী গদাইলস্করী চাল।

সত্যিই একটা ডেঁয়ে পিঁপড়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। ওটার হাবভাব দেখে ওর মুখ দিয়ে ছড়া বেরিয়ে এল ফস করে



ডেঁয়ে পিঁপড়ে লালসে না
তোর মতো কেউ আলসে না।
হচ্ছে কাজে রোজ দেরি,
করব রুজু ফোজদেরি।
আছিস যেমন খুব বোকা
নাক বাঁচিয়ে ছুঁবো খা।

পিঁপড়েটা ঘাড় ফিরিয়ে ফিক করে হাসল। 'গুড়গুড়িমশায়ের খোঁজ করছ তো? তা যাও না একটু এগিয়ে, তারপর,

একটু গেলেই দেখবে বাঁয়ে
লাঠির ডগায় থুতনি রেখে
গুড়গুড়ি তার নিজেয় গায়ে
সুড়সুড় দেয় থেকে থেকে।'

তিন

পিঁপড়ের কথামতো গুড়গুড়িমশায়ের দেখা পেয়ে গেল।

'আমি মনে মনে ভাবছিলাম' দিয়ে কী একটা আরম্ভ করতে যাচ্ছিল রাজু।

গুড়গুড়িমশাই জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল, 'উঁহু, মনে মনে ভাবা যায় না খুকি!'

রাজুর গা জ্বলে গেল। একে তো দাদামশায়ের গুরুঠাকুরের মতো ভাবখানা, তার ওপর বলা হচ্ছে কিনা খুকি। কেন আমার কি নাম নেই? সে-ও জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল 'আলবত যায়।'

'প্রমাণ?'

'প্রমাণ আমি বলছি'— রাজু গোঁ ছাড়েনি।

'তুমি যে বলছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দেখাটা তো প্রমাণ নয়। প্রমাণ হচ্ছে প্রমাণ হচ্ছে...' ঠিক কথাটা জোগাতে না পেরে গুড়গুড়ির কথা থামল, যদিও মাথা নড়াটা চলতে থাকল।

রাজু মনে মনে বলল, পথে এসো। পাশের হেলে পড়া আঁশফল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আনমনে কোদালের মতো বেড়ে ওঠা বুড়ো আঙুলের নখ কাটতে লাগল দাঁত দিয়ে। হঠাৎ

আসল কথা খেয়াল হল রাজুর, যে জন্যে গুড়গুড়ির কাছে আসা। 'আচ্ছা, আমার ডলপুতুলটা দেখেছেন ?'

গুড়গুড়ি গম্ভীর মুখ করে ভালমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল 'তোমার বয়েস কত হল খুকি ?'

'এই গত কার্তিকে দশে পা দিয়েছি।' একটু থেমে বিনীত ভাবে বলল, 'আমার নাম রাজু।'

'অ। এখনো পুতুল খেলো খুকি ?'

রাজু চটে জবাব দিতে যাচ্ছিল—একথা মা-মাসিদের কাছে বহুবার শুনেছি বাপু। কিন্তু এখন চটলে হবে না। রাজু সামলে নিয়ে বলল 'ডলপুতুলটা মানে, খুব ভাল পুতুল ওটা। একেবারে জাপানী ডলপুতুল। দেখেছেন ওটাকে?'

গুড়গুড়ি ছোট্ট করে বলল, 'দেখছি।'

'এখানে ?' —রাজুর খুব আশা হল।

'না ওখানে।'

'ওখানে কোথায় ?' রাজু পরিষ্কার করে জানতে চাইল।

'সেখানে।'

'সেখানে মানে?' রাজুও নাছোড়বান্দা।

'মানে, যেখানে থাকার কথা।'

হাল ছেড়ে দিয়ে রাজু শুধোল, 'কোথায় থাকার কথা সেইটাই তো জানতে চাইছি আপনার কাছে।'

'জানলেও তুমি ধরতে পারবে না। খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প পড়োনি ?' একটু দম নেবার মতো থামস। 'মাঝখানে একটা ব্যাঙাচি এসে সব তো ভণ্ডুল করে দিল।' বিজ্ঞের মত ভুরুটা ওপরে তুলে বলল গুড়গুড়ি।

'ব্যাঙাচি আবার কখন এল? পড়িনি তো?'

'আহা আসতেও তো পারে। আবার এও হতে পারে, আসতে পারত কিন্তু এল না।'

'কেন এল না ?'

'তা আমি কি করে জানব, আমি কি ব্যাঙাচির হাত গুনতে গেছি?'

রাজু মুখ বেঁকিয়ে ছড়া কাটল,

ছিল আদায় কাঁচকলাতে
এক বুড়ো আর এক বুড়ি ;
পাড়ার লোকে বলত সবাই
খুড়খুড়ে আর খুড়খুড়ি—
একটা ভালমন্দ নিয়ে
সকাল সন্ধে খুনসুড়ি।

চ্যালা কাঠের ঠ্যালার চোটে
ডুব মেরেছে গুড়গুড়ি।
গড়গড়াটা দেয়নি বুড়ি,
কাটছে বুড়ো বুড়বুড়ি।
ডাঙায় বসে বুড়ি এখন
খাচ্ছে মজায় গুড়মুড়ি।



শোনামাত্র গুড়গুড়িমশাই নিজের কানে সুড়সুড়ি দিয়ে জোড়াপায়ে লাফিয়ে পেছন ফিরে ছুট লাগাল। লাঠিটা যেখানে ছিল সেখানেই খাড়া হয়ে থাকল।

চার

রাজু ভাবল, এখন কী করা।

'কেন আমি আছি কী করতে?' —জবাবটা শুনে রাজু পাশে তাকাতেই দেখল ডালের ওপর বসে একটা কাক এধারে ওধারে মাথা দোলাচ্ছে। এই সেই ভুষণ্ডির কাক। দেখি এর মন গলিয়ে, 'আ হাহাহা কী তোমার গায়ের কুচকুচে রং, কী তোমার গলার মিহি আওয়াজ।'

কাক অমনি বলে উঠল ঃ

তিনসত্যি করছি হলপ
দিইনি গায়ে চুলের কলপ ;
আমার মতো বাংলা ভজন
গাইতে পারে হ্যাংলা কজন—
কিন্তু তারা পটলডাঙায়
উচ্ছে বীজে ডিজেল ভাঙায়।

পরে ব্যাখ্যা করে বলল 'এখন ভজনের চেয়ে ডিজেলের চাহিদা তো বেশি, তাই।'

লুফে নিয়ে রাজু বলল, 'হ্যাঁ বুঝেছি। তা তুমি তো এত কিছু জানো, আমার ডলপুতুলের খোঁজ জানো?

'আমি জানিনে, তবে পঞ্চসিদ্ধবাবা জানেন। তাঁর কাছে গেলে খোঁজ পেতেও পারিস। এঁর পুরো নাম ডিঙ্কচোলহিঞ্চ্যালু পঞ্চসিদ্ধ মহারাজ।'

'খুব সিদ্ধপুরুষ তাই না?'

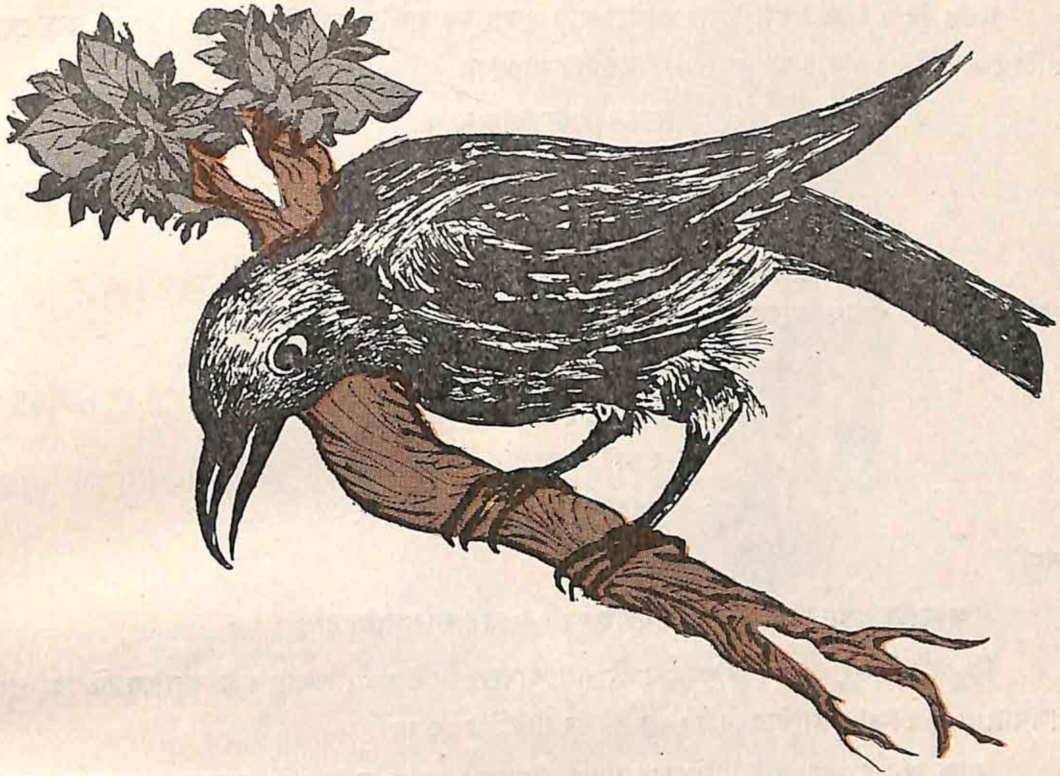
'তা আবার নয়? নাম শুনে বুঝতে পারিসনি?

বুঝতে পারছে, এইরকম ঘাড় নাড়ল রাজু। কিন্তু সত্যিই ও বুঝতে পারছিল না। অনেক সিদ্ধ সাধুবাবার কথা মা বাবা কাকা জেঠিমারা আলোচনা করেন। এইরকম বিদ্‌ঘুটে সিদ্ধবাবার কথা সে কখনো শোনেনি। ঢোক গিলে রাজু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এই বাবা কটা সিদ্ধ বললে?'

'কটা সিদ্ধ হবে কেন? সেদ্ধ হলে অবশ্য অনেক কিছুরই রঙ পাল্টায়, তুই ঠিকই ধরেছিস। তবে এর রঙ সিদ্ধ হবার আগেও যা ছিল এখনও তাই। একটু ফ্যাকাসে হতে পারে, তবে কালোই বলা চলে। ঠিক আলকাতরা যেমন।'

'আমি তা বলছিনে। কয়টা জিনিসে সিদ্ধ তাই-ই জানতে চেয়েছি'।

'ও তাই বল,' মুখ একটু গোমড়া হল কাকের। 'এমন কথা বলিস কেন যার পাঁচরকম মানে হয়?' একটু থেমে আবার শুরু করল 'পঞ্চসিদ্ধ মানে পাঁচটা জিনিসে সিদ্ধ। জিনিস পাঁচটা গুণে নে এক এক করে, আমি বলে যাচ্ছি —একনম্বর ডিম, কচু দুনম্বর, তিননম্বর হচ্ছে ওল, চারনম্বর হিঞ্চে, আর আলুটা হচ্ছে পাঁচনম্বর। সব সন্ধি করে ডিঙ্কচোলহিঞ্চয়ালু, এবার বুঝলি তো?'



রাজু মনে মনে ভাবছিল 'মা তো অনেক অনেক জিনিস সেদ্ধ দেয়। একসঙ্গে করলে একশটা হবে। মা তাহলে শতসিদ্ধ।'

কাকটা বোধ হয় শুনতে জানে। বলে উঠল, 'আরে সেদ্ধ দিলেই কি সিদ্ধ হয়? সব আলু সেদ্ধ হয়? সব ডিম সেদ্ধ হলে পচা ডিম আর কাকে বলে? ওল কখনো কখনো কচকচ করে কিনা বল?'

'করেই তো, আবার গলাও ধরে'—মানতে হল রাজুর।

'তবে?'

'ও সব তো খারাপ বলে সেদ্ধ হয় না ঠিকমতো।'

'খারাপ হলই বা', রাজুর বোকামিতে কাক অবাক হয়ে যাচ্ছে, 'খারাপ আলুকে আলু বলিস না? খারাপ ওল কি ওল নয়?'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি।' —বলে রাজু কয়েক সেকেণ্ড গুম হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'তা হলে ওঁর কাছেই যাই কী বলো?'

'হ্যাঁ তাই যা। এই যে বাঁদিকে রাস্তা দেখছিস ঘাসের চুলের মধ্যে টেরি কেটে গেছে এটা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটবি। তারপর ডাইনে ফিরবি, একটু গিয়ে আবার বাঁয়ে। আর খানিকটা গিয়ে পেছনে মোড়, এপাশে মোড়, ওপাশে মোড়, এপাশে মোড়, ওপাশে মোড় তারপর সোজা দক্ষিণে।'

এতোবার এপাশ ওপাশ শুনে রাজুর মাথা গুলিয়ে গেল। রাজু মাথা চুলকোতে লাগল।

অভয় দিয়ে কাক বলল 'সিধে এগিয়ে যা। ভালুকবাবাজীর দেখা পাবি পথে। তার কাছ থেকে রাস্তাটা জেনে নিস। আর ভয় পেলে এই মন্তরটা আওড়াস

কাক যদি হয় কাক না
গজায় সোনার পাখনা ;
করতে ওটা বিক্রি
যায় ফতেপুর সিক্রি।

কিংবা ভুলে গেলে এটাও আওড়াতে পারিস

বাধাস যদি ফ্যাকড়া,
লেলিয়ে দেবো কঁ্যাকড়া।
শুনেই হলো রাগ কি ?
তাই সরে না বাক্যি।

অথবা'

'অথবাটা এখন থাক, ফিরে এসেই শুনব'—বলেই পা চালাল রাজু।

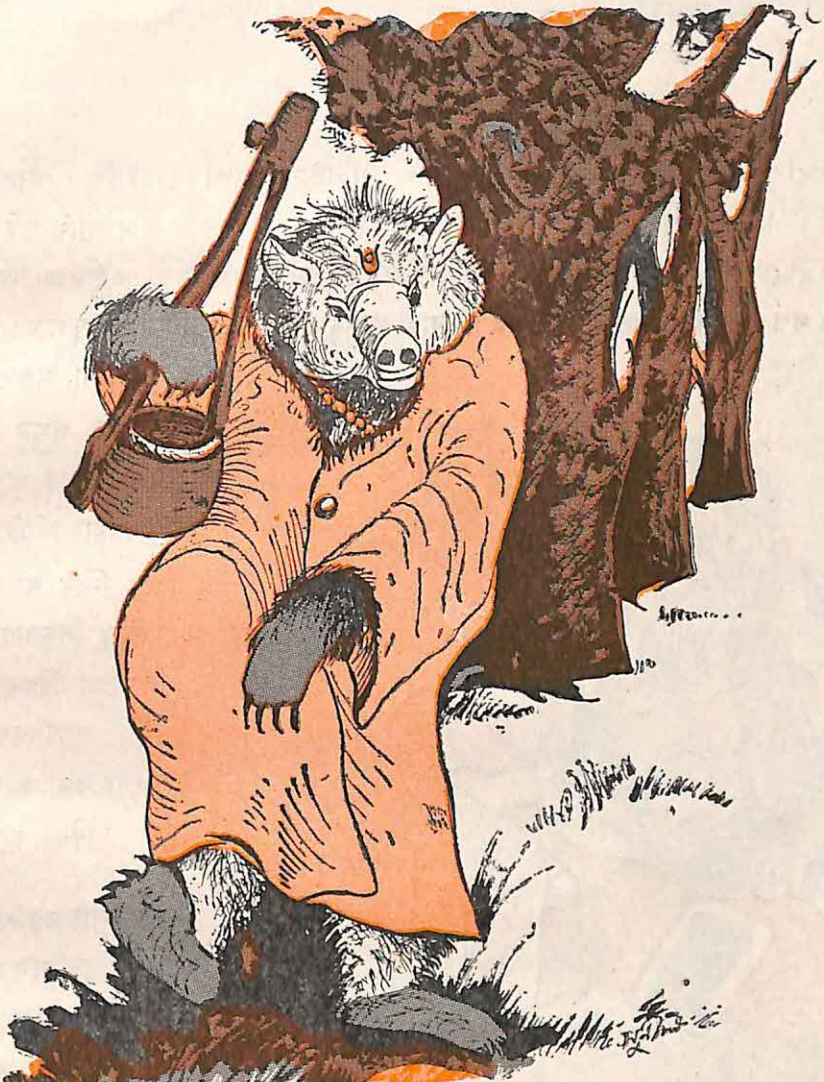
কিছুটা যেতেই দেখল ভালুকবাবাজী পথ আগলে দাঁড়িয়ে। গলায় কণ্ঠী, কপালে তিলক, পরনে আলখাল্লা। একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে কীর্তন গাইছিল সে।

রাজু বিনয়ে মাথা নুইয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবাজী, পঞ্চসিদ্ধ বাবার আস্তানা বলতে পারো ?'

'তা আর পারব না ? আমি হলাম গিয়ে, না না আমার হল গিয়ে সেজভাইয়ের পিসতুত শালীর ছোট ননদের দেওরের খুড়শ্বশুর, সে হল গিয়ে বলাগড় নিবাসী রায়বাহাদুর...'

'আর বলতে হবে না', বলে রাজু যোগ করল, 'খুব ভালো করেই জানি

রায়বাহাদুর বলাগড়ের ভালুক—
দক্ষিণে তার মস্তবড় তালুক।
দিঘি কেটে চাষ করে সে শালুক।
ভালুক রাজার তালুক যেমন বিরাট
সুখ্যাতি তার মগরা থেকে মীরাট।
নিন্দুকেরা থাকল পড়ে জিরাট।
নিন্দেমন্দ করে করুক কুলোক।
এতেই তারা পাচ্ছে তো পাক পুলক,
কিংবা রাতে দাঁতের গোড়া শুলোক।
মধুর সঙ্গে কয়েক টুকরো গাজর—
এই আহারে রাজার গায়ে যা জোর
একটু ঠোকায় ভাঙবে তোমার পাঁজর।'



শুনে ভালুকবাবাজী খুশি হয়ে পথ দেখিয়ে দিল। আরো বলল, 'তার সঙ্গে যদি দ্যাখা হয় তো এ অধমের খবর দিয়ে বোলো৷

কাকের পাশে আকার দিলে
হয় সে সবার কাকা,
টাকের আকার সবাই চেনে
হাতে পড়লে টাকা।'

'আচ্ছা' বলে রাজু এগিয়ে চলল।

পাঁচ

সিদ্ধবাবা গাবতলায় বসে কী একটা কাগজ লাটাইয়ের মতো গোটাচ্ছিল আর সুতো ছাড়ার মতো মেলছিল। কাজটা শেষ না হলে রাজু কথাটা পাড়ে কী ভাবে ? রাজু ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। ডান পা ভেরে গেলে বাঁ পায়ে ভর দিল। বাঁ পা ভেরে গেলে ডান পায়ে। এই রকম ডান পা বাঁ পা করতে করতে থপ করে বসে পড়ল একবার। বাবা এবার গোটানো থামিয়ে মুখ তুললো। বাবার জটা কোমরে প্যাঁচানো, অন্তত পাঁচ-ছ পাক। দাড়িটা কাঁধের ওপর তুলে দেওয়া ফুলবাবুদের কোঁচার মতো। গোঁফের ডগা দুটো চশমার ডাঁটির মতো কানের ওপর দিয়ে নিয়ে ঘাড়ে ফাঁস গিরো দেওয়া। রাজু সিদ্ধবাবার স্তব করল



ডিঙ্কচ্চোলহিঞ্চয়ালু
পঞ্চসিদ্ধবাবার
গুণের কথা করলে চালু
দিনটা হবে কাবার।

হাত পাঁচ ছয় লম্বা জটা
কোমরে খায় ছ-পাক,
কান প্যাঁচানো গোঁফের ঘটা
দেখলে সবাই অবাক।

একশ ছ-হাত কুষ্ঠী নিয়ে
করেন সৃষ্টি বিচার—
ভাবখানা তার সব মিলিয়ে
জিয়োগ্রাফির টিচার।

হাত জোড় করে বেশ ভক্তির ভাব ফোটাল রাজু।

'কী চাস ?'—গলাটা এমন খ্যাঁসখেঁসে যে রাজুর দাঁত শিরশির করে উঠল। না এলেই হত এর কাছে। এসে যখন পড়েইছে, তখন কথাটা পেড়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাবার মন গলানোর জন্যে একটু নাকী নাকী গলায় বলল, 'বাবা, আমার ডলপুতুলটা কোথায় বলতে পারো ?'

'কী রাশি ?'

রাজু এবার ভড়কে গেল। বিরাশি তিরাশি চুরাশি তিন রাশির কথাই তো রাজুর জানা আছে, কোন্‌টা বলবে ? কিন্তু অঙ্কের কথা মনে হলেই রাজুর বুক ধড়ফড় করে। কাঁদোকাঁদো সুরে রাজু শোনাল 'আমি অঙ্কে বড় কাঁচা।' সঙ্গে 'স্যার'টা জুড়ে ফেলেছিল আর কি।

'অঙ্ক ?' —ভুরু কোঁচকাল বাবা।

চট করে কথা ঘুরিয়ে ফেলল রাজু, 'জলরাশি'।

'লগ্ন ?'

'আটটা' বলে রাজু গড়গড় করে বলতে যাচ্ছিল, 'বর এসেছে বীরের ছাঁদে, বিয়ের লগ্ন আটটা।'

'উল্টে বল' — হুকুম হল বাবার।

রাজু আওড়াল ঃ

বীর এসেছে বরের ছাঁদে
বিয়েটা তদ্দণ্ড ;
মটকা চাদর ঝুলছে কাঁধে
গলায় গলগণ্ড।

বাসরঘরে যখন ক্রমে
গানবাজনা উঠল জমে,
কনের ঠোনায় ভিরমি খেতেই
শ্যালীরা কয় 'ভণ্ড'।

শ্বশুর বলে পাগলী মেয়ে,
বর উঠে কয় 'ষণ্ড'।

'বা বেশ, কিন্তু এতে লগ্ন নেই'—বাবা বলল।

'দণ্ড চলবে না ?' রাজু জানতে চায়।

'উঁহু, দণ্ড অনেক আছে—প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড, কোদণ্ড, দোর্দণ্ড। অনেক আছে বলেই চলবে না।' —আরজি নাকচ করে দিল বাবা।

'তা হলে ?'

বাবা এবার একটু নরম হয়ে বলল, 'আচ্ছা, লগ্ন না পারিস পল বল।'

পল ? প্রথমে টিনোপল বলতে যাচ্ছিল রাজু। আবার ভাবল, এখানে কি ওটা চালু হয়েছে ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল কদিন আগে বাবা কাগজ থেকে মাকে একটা খবর শোনাচ্ছিল। কোথায় বুঝি অনেক লোক তেরপল চাপা পড়ে জখম হয়েছে। অমনি চট করে বলে ফেলল, 'তেরপল'।

মনে হল সন্তুষ্ট হয়েছে বাবা। তারপর শ্লেট টেনে নিয়ে পেন্সিলে বিস্তর আঁক কেটে ঢ্যাড়া দিয়ে শূন্য দিয়ে গুনতে লাগল। মুখ তুলে বলল, খুউব সোজা।'

'সোজা ?'

'হ্যাঁ, সোজা। ত্যাড়া নয়, বাঁকা নয়, উল্টো নয়, ঘোরালো নয়, প্যাঁচালো নয়।'

'তা হলে কোথায় আছে ডলপুতুলটা ?'

'সোজা —উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে উপরে নীচে পাশে—সোজা। জল একেবারে—স্থল নয়, গাছ নয়, পাথর নয়, আকাশ নয়, মেঘ নয়।' পাশে রাখা মোটা পুঁথিটার কয়েকটা পাতা ফরফর করে উড়িয়ে বলল, 'এই ত্যাখ 'সোজা'-র কত রকমের অর্থ। আবার 'অর্থে'-র জায়গায় ত্যাখ 'অর্থে'-র কত রকমের 'মানে'। আবার 'মানে' যেই এল আঃ তার কত রকমের যে প্রয়োগ।'

'কচু প্রয়োগ'—রেগে গেলে রাজুর মুখে কচু কথাটা বেরোয়।

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। 'মানকচু'-তে মানের সঙ্গে কচুর প্রয়োগ আছে, আর জানিস তো আমি সেই 'কচুসিদ্ধ'।'

'কচুসিদ্ধ না ঘেঁচুসিদ্ধ'—আরো রেগে যায় রাজু।

'সবুর কর, ঘেঁচুটা আবার কোথায় আছে দেখি'—পাতা ওল্টাতে লাগল পুঁথির।

সেই ফাঁকে রাজু সরে পড়ল গুটিগুটি।

যেতে যেতে রাজু ভাবল, এদেশে কি একটাও লোক নেই যে আমার ডলপুতুলের খোঁজ দিতে পারে ? হঠাৎ কানে ভেসে এল দূর থেকে কাড়া নাকাড়ার আওয়াজ। আওয়াজটা এদিকেই আসছে।

হাঁকনদার কাছে এসে হাঁকল, 'অদ্য রাজা স্বরচিৎ গদ্য পাঠ করবেন। আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।' সঙ্গে নাকাড়া বাজলো —ড়ুড়ুং ড়ুড়ুং ড়ুং।

আর কেউ না পারুক, রাজু ভাবল, রাজা নিশ্চয়ই আমার ডলপুতুলের খোঁজ দিতে পারবে। তাছাড়া এতদিন তো স্বরচিত পদ্যপাঠ শুনে এসেছি, এবার না হয় শোনা যাবে স্বরচিৎ গদ্যপাঠটা।



কোন্‌দিকে রাজবাড়ি কে জানে, রাজু ভাবল। যাই তো এগিয়ে, এই মনে করে চলতে চলতে এক জায়গায় দেখল ছাতার তলায় ব্যাঙামশাই পদ্য মকস করছে। সভাকবি কিনা, সব ঘটনা নিয়েই তাকে পদ্য লিখতে হয়। ছয় লাইন লেখা হয়েছে কলাপাতে। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। আগেকার কালে পাঠশালার গুরুমশাইকে দেখাবার জন্যে বাবা-কাকারা যেমন লিখতেন।

সামনে শ্রোতা পেয়েই শুনিয়ে দিল ব্যাঙা



তোমরা কি কেউ বলতে পারো—
এমন ব্যাপার হয় না কারো?
ধরো কালকে যাচ্ছ কাশী—
সেখানে এক থাকেন মাসি।
মাসির হঠাৎ গজায় দাড়ি
গিয়ে পড়লে মামার বাড়ি।

'খুব সুন্দর হয়েছে'—খুশি হয়ে বলল রাজু। বাবার লেখার মতো কঠিন না। আর মানেও বোঝা গেল সব কথার। বাবার কাছে এক কাকু আসে, তারও কিন্তু মত—শুনতে ভাল হলেই হল ও মানে দিয়ে কী দরকার? তবে দুঃখের বিষয়, তার পদ্য শুনলে মনে হয় কেউ কাঠের ডুগডুগি বাজাচ্ছে। আপসোস করার মতো শব্দ করে বাবা চায়ের কাপে চুমুক দেয়, যখন কাকু তার পদ্য পড়ে। আর রাজু বারান্দায় বসে ডলপুতুলের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারে আর বলে—ভাল করে গুছিয়ে কথা বলতেও শিখলিনে এখনো? শেয়াল কুকুরেও পুঁছবে না।

আহা ডলিরে। ডলপুতুলকে রাজু আদর করে কখনো কখনো ডলি বলে। ব্যাঙামশাইকে শুধিয়ে দেখি কোনো খোঁজ রাখে কিনা, 'ব্যাঙামশাই, আমার ডলপুতুলটা খুঁজে পাচ্ছিনে।'

'বলছি, আগে 'কচুরি'-র সঙ্গে একটা মিল দে তো?'

'উম্, ছুরি না, ছুরি-চাকু বড় সাংঘাতিক জিনিস। তাহলে চুড়ি, না না, খিচুড়ির আর বাকি রইল কী। ঠিক হয়েছে, চুরি। এর আগের অক্ষরটা খুঁজলেই পাওয়া যাবে।'

ব্যাঙা আপত্তি তুলল, 'উঁহু, চুরির লাইনে আমি নেই।'

সেই সময় সেখানে একটা শিঙি এসে হাজির। সে পুরোদস্তুর আধুনিক কবি এবং সাংবাদিক। চুরির কথাটা লুফে নিয়ে সে বলল, 'গরুটা তাহলে চুরি গেছে? রাজামশাই একটা গরু ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা কেউ চুরি করছে না। এদিকে শূলে যে জং ধরে গেল। চোর না পেলে শূলে চড়াবেন কাকে? যাই এখন খুঁজে দেখিগে কার মুখটা গরুচোরের মতো দেখাচ্ছে।

রসভঙ্গ হল দেখে ব্যাঙা তাচ্ছিল্য করে বলে উঠল,

> হচ্ছে কথা কচুরির
> খবর দিচ্ছে গোচুরির।

শিঙিও জবাব দিল, 'তোর মত 'ব্যাঙাচি'-র সঙ্গে 'ঘামাচি' মিল দেওয়া পদ্য আমি লিখি নে, বুঝলি? আর 'সরবৎ'-এর সঙ্গে মেলাব বলে 'পর্বত'ও বয়ে আনি নে।

> বস্তাপচা পদ্য লিখে
> আশা করছিস বাহবার?
> তোর কপালে জুটবে সেটা
> গাধার পক্ষে যা হবার।'

ব্যাঙাও সুর করে কাটান দিল,

> আমার সঙ্গে পাল্লা? ওরে,
> আমি হচ্ছি ক্লাসিকাল;
> আধুনিক তুই কষ্ট করে
> আজ যা লিখিস—বাসি কাল।

জবাবে মিহি গলায় শিঙি বলল, 'তোর পদ্য তো খুব দামী, তা

দামী পদ্য তোর, ব্যাঙা রে,

তাই ঝুলিয়ে রাখ হ্যাঙারে।

আর আমি পদ্য ভাসাই খরস্রোতে

মায়া নেই যে খরচ হতে।'

হাবভাব দেখে বোঝা গেল শিঙির পদ্যই বেশি পছন্দ হয়েছে রাজুর। রণে ভঙ্গ দিয়ে ব্যাঙা গা-ঢাকা দিল ছাতার তলায়।

শিঙি বলল, 'রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছ তো? চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।'



রাস্তায় নেমে শিঙি বলল, 'তা হলে এক গল্প বলি শোনো।' বেশ খানিকক্ষণ কেশে গলা পরিষ্কার করে শিঙি আরম্ভ করল, 'আমার দিদিমার বাড়ি ছিল হাউসখালি। নাম শুনেছ হাউসখালির? শুনবেই বা কী করে, কত ছোট যে তুমি। সে থাকগে', বলে একটু দম নিল, 'ওখানে রায়বাড়ির ডোবায় আমার জন্ম। ডাঙায় সেদিন কী ঘটা কী ঘটা'—এমনভাবে কথাটা বলল যেন ওর নিজেরই জন্মদিন, আর শুঁড় দোলাতে লাগল ঘনঘন।

রাজু ফোড়ন কাটল, 'তুমি জানলে কী করে?'

'বা রে! মার কাছে গল্প শুনেছি কতবার।'

'তোমার মা খুব ভাল ভাল গল্প জানে, তাই না? আমার মা-ও জানে। কিন্তু বলতে চায় না। গল্প বলতে বললে বলে "জ্বালাতন করিসনে বাপু। বেশি আবদার করলে ঢিপিয়ে দেব।" "ঢিপিয়ে দেব" মানে জানো?'—রাজু আচমকা প্রশ্ন করে বসে।

'কথার আবার আলাদা মানে আছে না কি?'

'বাঃ, মানে নেই? তবে মানেবই কি ছাপা হয় এমনি এমনি! আমাদের পড়ার জন্যেই ত।' রাজু একটু ভারিক্কি হবার চেষ্টা করল।

'কী জানি বাপু, আমরা মানেও খুঁজি নে, মানেবইও পড়িনি। তাই বলে কি কথা বলতে পারছি নে! তবে, যশোর জেলার মানে গলা ধরে না এটা একবার শুনেছিলাম বটে।'

'থাকগে, তোমার গল্পটা বল'—রাজু কথা চাপা দিল।

'রায়বাবুর পুকুর ছেঁচা হল একদিন। জামাই মেয়ে বাড়ি ফিরবে, সঙ্গে কিছু জ্যান্ত মাছ দিতে হবে। ওদের বাড়ি হল শোলকুপোর কাছে। ও-ধারে গেছ কোন দিন?'

'আঃ, খালের ধারে কী সুন্দর জায়গা। একটা বটগাছের তলায় একজন বাঁশের মাচা বেঁধে তার ওপর বিড়ি দেশলাই সাজিয়ে রেখেছে বিক্রির জন্যে। এক-আধজন খদ্দের আসছে যাচ্ছে। একজন বোরেগী দোতারা বাজিয়ে গান গাইছে।' রাজু বানিয়ে বানিয়ে বলল। অবশ্য সবটাই বানানো নয়। ওদেরও বাড়ি আসতে খাল পড়ে একটা।

'তাই হবে। মার কাছে শুনেছি, গান শুনতে শুনতে আর বিড়ি টানতে টানতে জামাইবাবু এমন আনমনা হয়ে গেছল যে, মা ঝুপ করে পড়ে সটান ঢুকল একেবারে খালের জলে। ঠিক সেই সময় মাথার ওপর ঝপাং করে পড়লো একটা কাঁচা বাতাবি লেবু।'

'বাচ্চারা বল খেলছিল বোধ হয়'—রাজু যোগ করল।

'তাই হবে। ছুটো ছেলে জলে নেমে পড়ল ওটা তুলতে। একটু হলেই মার ঘাড়ে পড়ছিল আর কি।'

'আর তোমার মা কাতিয়ে দিল, তাই না?'

'আরে না না, বাচ্চা ছেলেপিলেকে মা কখনো কাতায় নি।'



'তারপর কী হল?'— রাজু আবার খেই ধরায়।

'এবার একটু ডাইনে ঘুরি' বলে ঘুরপাক খেল একটা। গোল শরীর তো শিঙির, মোটেই দিক বদলাল না।

'তারপর?'- রাজু আবার খোঁচাল।

'মা নালা ধরে স্রোতের উল্টোমুখো গিয়ে এক ডোবায় এসে আস্তানা নিল। আমার জন্ম ওইখানে। সেখানে থেকে তোমাদের নন্দকাকার বদনা চেপে আমি আর মা তোমাদের বাড়ি এলাম। আমার মা মুটিয়ে গেছল একটু, তাই বদনার নল দিয়ে বেরোতে পারল না। আমি দিব্যি বেরিয়ে এখানে চলে এলাম।'

শিঙি একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'যাই বল বাপু, তোমাদের ভাষাটা বড় আজব জিনিস।'

রাজু জিজ্ঞেস করল 'যেমন?'

'যেমন', একটু টেনে টেনে বলল কথাটা, 'তোমরা কথায় কথায় পড়ো। তোমরা শুয়ে পড়ো, উঠে পড়ো, বসে পড়ো, নেমে পড়ো, দাঁড়িয়ে পড়ো, এমন কি মুষড়ে পড়ো। ইস, কত রকমভাবে

যে পড়ো তার ইয়ত্তা নেই। এখানে হলে আমাদের একখানা হাড়ও কি আস্ত থাকত? এত পড়েও তোমাদের আহিঙ্কে মেটে না, তোমরা আবার বই পড়ো।'

[illegible] আবার রাজু একদম সইতে পারে না। 'দাঁড়াও তোমার পণ্ডিতি বের করছি' [illegible]

বড়ই [illegible] [illegible]াদক।
থাকে তোমার সংবাদে
আসল কথা রং বাদে?
খাওগে গুলে বুদ্ধি হে
রামছাগলের দুধ দিয়ে।

শুঁড়টা ছেড়ে দিতেই শিঙি গড়াতে গড়াতে পাশের নালায় নেমে গেল। রাজুও মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগল।

আট

যেতে যেতে এক জায়গায় রাজু দেখল দু দল দু দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বসে কোমর বেঁকিয়ে ঘাড় তুলে, ঘাড় নামিয়ে, কাত হয়ে সোজা হয়ে কী সব দারুণ দারুণ জিনিস ছুঁড়ছে। এদল ওদলের দিকে পিঠ করে রয়েছে। কী ছুঁড়ছে সেটা অবশ্য রাজুর নজরে আসছিল না, তবে জিনিসগুলো যে সাংঘাতিক মারাত্মক তা ওদের মুখ-চোখের হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল। আর কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে একজন পায়ে তাল ঠুকছিল। তার হাতে একটা দুহাত লম্বা তালপাতার ভেঁপু।



রাজু মুখ কাঁচুমাচু করে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি?'

প্রশ্নটা লুফে নিয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি রেফারি।' পায়ে তাল ঠোকা চলছে সমানে। 'আমি তাল সামলাচ্ছি দেখছ না?'

'কিসের তাল ?'

'সোনার তাল নয়, গাছেরও তাল নয়—তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'তা পাচ্ছি বই কি।' রাজু স্বীকার করল। আবারও প্রশ্ন করল—'কিসের তাল ?'

'ফাঁকতালে জেনে নেবার তাল খুজছ না তো ?'

'আজ্ঞে না'—রাজুর মুখে বিনয়ের ভঙ্গী।

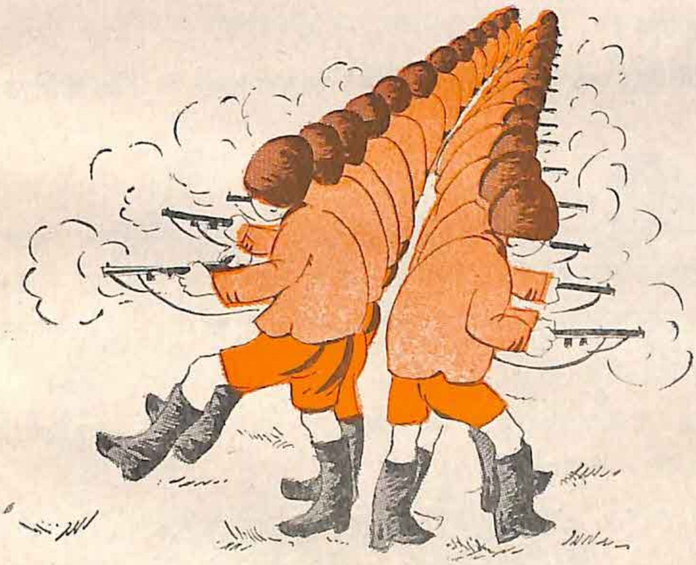
'তবে শোনো। অনেক অস্ত্রশস্ত্র জমে গেছে তো, তাই ওরা যুদ্ধ করে সেগুলো নষ্ট করছে।'

'ওঃ, যুদ্ধ হচ্ছে তাহলে'—আমরা আমতা করল রাজু। 'তা যুদ্ধই যদি হচ্ছে তবে এদল ওদলকে মারছে না কেন ?' রাজু ভাবনায় পড়ল, আমরা তো ইতিহাসে পড়ি যুদ্ধে একদল আরেকদলকে আক্রমণ করে। দুইদলেরই বিস্তর লোক মারা পড়ে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। রাজুর জানা যুদ্ধের সঙ্গে এযুদ্ধের মিল নেই।

রেফারি তাল ঠুকতে ঠুকতে জবাব দিল, 'আমরা মাথা খাটিয়ে এই যুদ্ধটা আবিষ্কার করেছি। যেমন যুদ্ধের নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করেছি, তেমনি যুদ্ধের নতুন এই কায়দাটাও।'

'নতুন নতুন অস্ত্র !' রাজু জানতে চাইল, 'কী, অ্যাটম বোমা ? নাপাম বোমা ? নিউট্রন বোমা ?'

'ছ্যাৎ !' তাচ্ছিল্য ফুটল রেফারির মুখে, 'ওসব তো পটকা। আরো মারাত্মক, বুঝলে ? একটা বোমা নল থেকে বেরোবার আগেই খতম হয়ে যায় নিজে থেকে এটার নাম, 'আপ খতম।' আর একটা 'শব্দনাশ'—এর ভীষণ শব্দ হবার আগেই শেষ, কানে একটু ফুসও পৌঁছোয় না। এইরকম শত শত অস্ত্র।'



'উঃ কী দারুণ'—রাজুকে মানতে হল। মাথা চুলকে রাজু এবার জিজ্ঞেস করে, 'এ যুদ্ধ থামবে না ?'

'গান শুরু হলে গান থামে না ? নাচ শুরু হলে নাচ থামে না ?—এইরকম যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন থামতেই হবে।'

'কখন থামবে ?'

'সব অস্ত্র ফুরিয়ে গেলেও থামতে পারে। আবার, দুপক্ষ ক্লান্ত হলেও থামতে পারে। অবশ্য তাল বুঝে আমিই বাঁশি বাজাই।'

রাজু দেখতে দেখতে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর রেফারি প্যাঁ

প্যাঁ করে ভেঁপু বাজাল। অমনি সবাই দুটো করে থাবড়া মারল নিজের গালে। মুণ্ডুগুলো ঘুরে গিয়ে মুখোমুখি হল। তারপর হাসতে লাগল কান্নার মত ভেউ ভেউ করে।

রাজু হাততালি দিয়ে উঠল, 'তোমাদের শান্তিটাও বেশ ভাল। কোন চুক্তি করতে হচ্ছে না, সিমলা তাসখন্দ জেনেভায় ছোটাছুটি করতে হচ্ছে না। তবে'—বলে একটা ঢোক গিলল রাজু, 'তোমাদের হাসিটাতে আমার খটকা লাগছে। হাসি আর কান্নায় যদি এমন গুলিয়ে যায় তবে তো হাসিতে আর কাশিতে কোন তফাত থাকবে না।'

রেফারি শুধরে দিল, 'গুলোই নি। বাজে খরচ কমিয়েছি। আমরা হাসি ভেউ ভেউ করে আর কাঁদি শুধু চোখের জল ফেলে। এটা আর কিছু নয় একটু অভ্যেস।'

'ও, তাই বলো। আমরা হা হা হি হি হো হো করে হাসি, আর', রাজু ফোড়ন কাটল,

তোমার কথা শুনে আমার
পাচ্ছে হাসি মুচকি।

রেফারি পাল্টা জবাব দিল

অমন করে আর হেসো না
করবে ব্যথা কুঁচকি।

'কী রকম ?'—ভ্যাবাচ্যাকা খায় রাজু।

'রকম আবার কী ? সর্দিতে নাক দিয়ে জল গড়ায়, কান্নায় চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কিন্তু হাসিতে কি মুখ দিয়ে জল গড়ায় ?'

'না তো।'

'তবে ? হাসতে গেলে হয় শব্দ দরকার, নয় তো আর কিছু দরকার। তাই যদি বিনে শব্দে মুচকি হাসো তো নাচন কোঁদন করতে হবে। কুঁচকি ব্যথা করবে না ?'—রেফারি জলের মতো বুঝিয়ে দিল।

'কিন্তু তোমার গায়ে র‍্যাপার কেন রেফারিদা ?'—কথায় কথায় বেশ ভাব জমে গেছে রেফারির সঙ্গে। 'এই গরমকালেও গায়ে র‍্যাপার! র‍্যাপারটা কী!'

'এ-ও বুঝলে না! কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সামলাতে হচ্ছে এই শর্মাকে। যদি ভয় পেয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকি! তাই র‍্যাপার জড়িয়ে রেখেছি গায়ে।'

হঠাৎ কী খেয়াল চাপল রাজুর মাথায়, রেফারির হাত থেকে আচমকা ভেঁপুটা ছিনিয়ে নিয়ে বাজিয়ে দিল এলোপাথাড়ি—পিঁপিঁপ পিঁপ পিঁপিঁপ। অমনি সেপাইরা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি ঘুষোঘুষি আরম্ভ করে দিল।

রেফারি তো গোড়ায় থ' হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাড়াতাড়ি রাজুর মুখ থেকে ওটা টেনে নিয়ে নিজে বাজাল বেশ টানা কাঁদুনে সুরে। তখন শান্ত হল সব।

এতখানি হবে রাজুও বুঝতে পারেনি। রেফারি রাজুকে বকুনি দিল, 'এক্ষুণি সব কায়দা-কানুন বানচাল করে দিচ্ছিলে।'

রাজুও বাঁকা হেসে বলল, 'কেমন ছুঁচ হয়ে ঢুকেছি ত্যাখো এইবার,
র্যাপার মোড়া রেফারিদা
বাঁধো বোঁচকা বুঁচকি ;
ব্যাপারটা কি থাকবে থেমে,
ফাল হব না ছুঁচ কি ?'

রেফারি আর দেরি না করে ভেঁপু বাজাল, আর সবাই রেফারির পেছন পেছন তাল ফেলে ছুটল।

রাজুও সামনে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে একটা গাছতলায় একটু দাঁড়াল। হঠাৎ মনে হল ওপরের ডালে বসে কেউ কাউকে শাসাচ্ছে।

নয়

এই যে ব্যাটা বস্তিবাটির নায়েব,
বের করে দে যা করেছিস গায়েব।
দিস তো ফুলেল তেল মাখাব, নইলে একা কদমা খাব,
তোর নামে এক মামলা করব দায়েব।



চোখ তুলে তাকাতেই রাজু দেখতে পেল হুতোমী আর তার পাশে হুতোমপ্যাঁচা ওর দিকে তাকিয়ে আছে জুল জুল করে।

'দায়েব' কথাতেই বোঝা গেল হুতোমীর বই পড়া আছে। আর এটা সেই বই যাতে 'দায়েব'-এর, 'র' এর কোটা পড়ে নি ছাপায়। বাবা বলে, বইয়ে ছাপার ভুল থাকা খুব খারাপ। তা হতে পারে। তবে এখন মনে হচ্ছে ছাপার ভুল না হলে কি অমন সুন্দর মিলটি পাওয়া যেত ?

তা না হয় হল, কিন্তু হুতোম কী গায়েব করেছে সেটা তো জানা গেল না।

হঠাৎ রাজুর মনে পড়ল, আরে, এরাই তো ওদের বাড়ির উঠোনের নারকেল গাছের মাথায় প্রায়ই ঝগড়া বাধাত

তুই খুলি না মুই খুলি
টাকার কোলা কই খুলি।

টাকার কোলা যে গায়েব হয়েছে সেটা বোঝা গেল, কিন্তু হুতোমী জানল কী করে হুতোমই সেটা গায়েব করেছে ?

তখনি শুনল হুতোমী বলছে ঃ

পড়ি বোকনার খপ্পরে
ডিটেকটিভের গপ্প রে।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হল রাজুর কাছে। বোকনমামা না ক-রাত্তির বারান্দায় একটা ছুটো পর্যন্ত ডিটেকটিভ বই পড়েছিল ? ঠিক ধরেছি। তাই বড় ডিটেকটিভ হয়ে পড়েছে। এর কাছে ডলপুতুলটার খোঁজ করে দেখলে হয় না ?

যেই ভাবা, অমনি ডিটেকটিভের গলা শোনা গেল ঃ

দেখি একদিন রাত্রে
যায় একা একা সাঁতরে।

ইস্! কোনো দিন একা থাকে নি ডলিটা। কী হবে, কেউ ধরে খেয়ে ফেলে নি তো ?

রাজু হন্ হন্ করে পা চালাল।

পথে দেখা এক শেয়ালের সঙ্গে। মাথায় টিকি, কপালে ফোঁটা তিলক, গায়ে নামাবলী। শেয়াল ওকে দেখেই মুখখানা গম্ভীর করে ফেলল। রাজু চিনল—এ শেয়ালপণ্ডিত।



যেচে আলাপ করল রাজু, 'এই যে পণ্ডিতমশাই, কাছেই থাকা হয় বুঝি?'

'ঠিকঃ ধরেংছো দেখছিঃ' অনুস্বার বিসর্গে বিদ্যে গজগজ করছে। 'আমিঃ একটা নতুনং ভাষায় কবিতাঃ লিখেংছি। শুনবেং নাকি হেঃ?'

'তা বলুন না। শুনলে তবু যদি জ্ঞান বাড়ে।' রাজু উৎসাহ দেখাল।

'শোনং

নেল জেনিক্কে মিলেগাচ্চ

বিলে বিবিৎ গেমেল বরি জুন মদিনে দম লবরি
জেনপেচাকে সেম জুসি হে গণিতাঙ্ক জুন মুসিহে
গেলুম মিহে ঘেনে হাঁচ্চো।

'এটা কি ছড়া বললেন, পণ্ডিতমশাই?'

পণ্ডিতমশাই গদগদভাবে একটু হাসল।

'বাঃ, এ ভাষায়ও তো মিল আছে দেখছি। তবে, ছন্দের কায়দাটা, পণ্ডিতমশাই, হুবহু আমাদের বাংলারই মতো। দয়া করে বাংলা করে শোনান না।'

পণ্ডিত শোনাল— না পড়েই পাশ চাচ্ছো?
বলে দিই সোজা রাস্তা বই ছিঁড়ে করো খাস্তা।

এটুকু শুনেই রাজু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। একথা সে-কথা ভাবতে ভাবতে দু লাইন ফসকে গেল। শেষ লাইনটা শুনতে পেল রাজু —নাকে পুরে তোলো হাঁচ্চো। ফসকানো লাইনদুটো আবার বলার জন্যে বলতে রাজুর সাহস হল না। তাই সে খুবই বিনীতভাবে পেশ করল, 'হাঁচির ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন পণ্ডিতমশাই?'

'ব্যাপারটাঃ আমারং বাবাঃ ভালোং বলতঃ। যেহেতুঃ সত্যিং কথাঃ বলতেং কি, ভাষাটাঃ বাবারং আবিষ্কারং কিনাঃ।'

'আপনিই বলুন না'—রাজু বলল।

শেয়াল আওড়াল

জুসি লিম্পে লুচ্চ মায়াক পেগেলিন
জেনপেচাকে পুচিলে সেম ছেগেলিন।
ভেবুচ্চ সঙ গণিতাঙ্ক জুন নলু
কিল মুসিহে বিবিম নাকু সুন্নলু
মেটিল গেটি ডুম ন সিগল এমুরাক
ঘাচাঙ ছিচে ঘেন্নে বিবিম নেমুরাক।

'মানে?'—সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পণ্ডিতের -অর্থাৎ বলতে হবে কি না বলো।

'বললে তো বড় উপকারই হয় পণ্ডিতমশাই', রাজু বলল।

'তবেঃ শোনং ঃ

ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছ মায়ের আদর,
পড়াশুনো ঘুচিয়ে সব বাঁদর।
আঁকছ ছবি গণিতের বই খাতায়।
তাল পাকিয়ে দেব এবার মাথায়।
এতেও যদি রোগ না সারে তোমার,
আছড়ে পেটে আওয়াজ তুলব বোমার।

পরের ছড়াটা শুনে না-শোনা লাইন ছুটো ধরে ফেলেছে রাজু। এ আর বেশি কী। মানে তো পরের ছড়াটার মধ্যেই রয়েছে। তবে হ্যাঁ, 'হাঁচ্চো' আর 'হে'-টা নতুন ভাষাতেও একই আছে। খুবই মজা লাগছিল রাজুর। মুখে বলল, 'সত্যি ? দেখান না কায়দাটা একবার।'

'এমন করেং' বলে ঠ্যাং তুলে দেখাতে গিয়ে নিজেই আছাড় খেল পণ্ডিত। উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বলল, 'প্রাণে বড্ড বেঁচে গেছি রে। উ হু হু হু।' ব্যথার চোটে অনুস্বার বিসর্গ লোপ পেয়ে গেছে। তার পর হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে বলল, 'বাবা তো আমাকে দেখাতে গিয়ে মরেই গেল। ও বাবা গো, কোথায় গেলে গো।' কাঁদতে কাঁদতেই পাশের ঝোপে সুট করে ঢুকে পড়ল।

এগারো

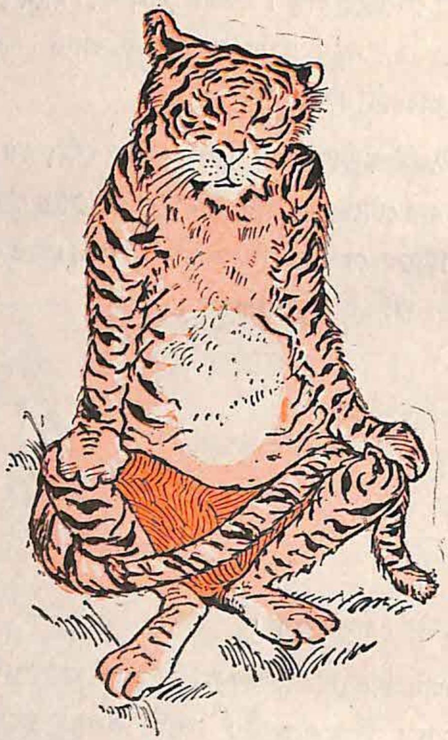
অমনি সুড়ৎ করে একটা লাফারু বেরিয়ে এল ওই ঝোপ থেকে।

রাজুকে সামনে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেল এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা, বনকাপাসির বাঘের মাসির খবর জানো? সে আমার দিদির জ্যাঠতুত ননদের পিস্‌শাশুড়ী। আমি এখানে আসার পর তাদের কোনো খবরই পাইনে।'

রাজু চটপট জবাব দিল, 'তা আবার জানব না? তবে'—নিজের দর বাড়াবার জন্যে যোগ করল 'খুব সংক্ষেপে বলব, আমার খুব তাড়া আছে



বনকাপাসির
বাঘের মাসির
দাঁত তো মোটে তিনটে ;
আর গোটা ছয়
না হলে নয়
বায়না দিল মিণ্টে।
হয় খুঁত বার—
বিষ্যুৎবার
বারবেলা পায় মালটা ;
তাই ত এমন
হবিষ্যে মন,
বোনপো-কে কয়, পাল্টা।



মাসির বিধান—
খায় পাকা ধান,
খুব অরুচি মাংস।
দিচ্ছে আরাম
যোগ-প্রাণায়াম,
সারছে টি বি লাংসে।
কিন্তু মাসির
হুপিং কাশির
নেই যে ভাল বড়ি ;
খুব বাঁচোয়া
হয়নি চোঁয়া
ঢেকুর তোলা সর্দি।'

'মরলে সগ্‌গে যাবে দুজনে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল লাফারু। কী পুণ্যিই করছে, তাই না ?'

'ব্যস ব্যস', রাজু বলল, 'তোমাকে তো অনেক খবর দিলাম এবার বলো, আমার ডলপুতুলটা দেখেছ ? বলতে পারো সে কোথায় ?'

লাফারু কানদুটো একবার খাড়া করল, একবার হেলাল। 'আমি বলতে পারতাম। আর যদি পারতাম তাহলে বলতে পারতাম। সুতরাং পারতাম যেহেতু পারতাম' বলতে বলতে কথা ঝিমিয়ে এল লাফারুর। কাজের কথা বললেই লাফারুর ঝিমুনি আসে, রাজু তা জানত না। তাই বলল, তোমার কথার কায়দা শুনেই বুঝেছি তুমি জানো না। চলো না দুজনে মিলে এগোই, ডলিকে খোঁজাও হবে আবার রাজবাড়ি দিকেও যাওয়া হবে।' বলতে বলতেই দেখল লাফারুর চোখ বুঁজে গেছে। রাজু ভাবল মটকা মেরে পড়ে আছে লাফারু। তাই চাঙা করার জন্যে খোঁচা দিয়ে ছড়া কাটল

এতেই যদি গুস্‌সা হোস
কিসের তবে দুঃসাহস ?

চোখ কচলাতে কচলাতে লাফারু বলল, 'উঃ, কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলাম। যদি দেখলাম; কেন দেখলাম ? ধর দেখলাম, কী দেখলাম ? যা দেখলাম, তাই দেখলাম।' গলাটা ঝিমিয়ে এল লাফারুর। রাজুও ছড়া কাটল

ঘুম থেকে পেতে রক্ষা
বনধুন্দুলের টক খা,
বেশি নয় এক ঢোক খা।
নয় বিজলির শক খা।

লাফারু চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, 'ওহো কী বিচ্ছিরি ব্যাপার, বাবারে! বিচ্ছিরি বলে বিচ্ছিরি। যেমন বিচ্ছিরি, ঠিক তেমন বিচ্ছিরি।' আবার ঘুমোতে যাচ্ছে দেখে রাজু টিপ্পনি কাটল এবার

ঘন ঘন ঘুম যাও
তুমি বড় ঘুমবীর
সিংহের মেসো তুমি;
ছোট ভাই কুম্ভীর।

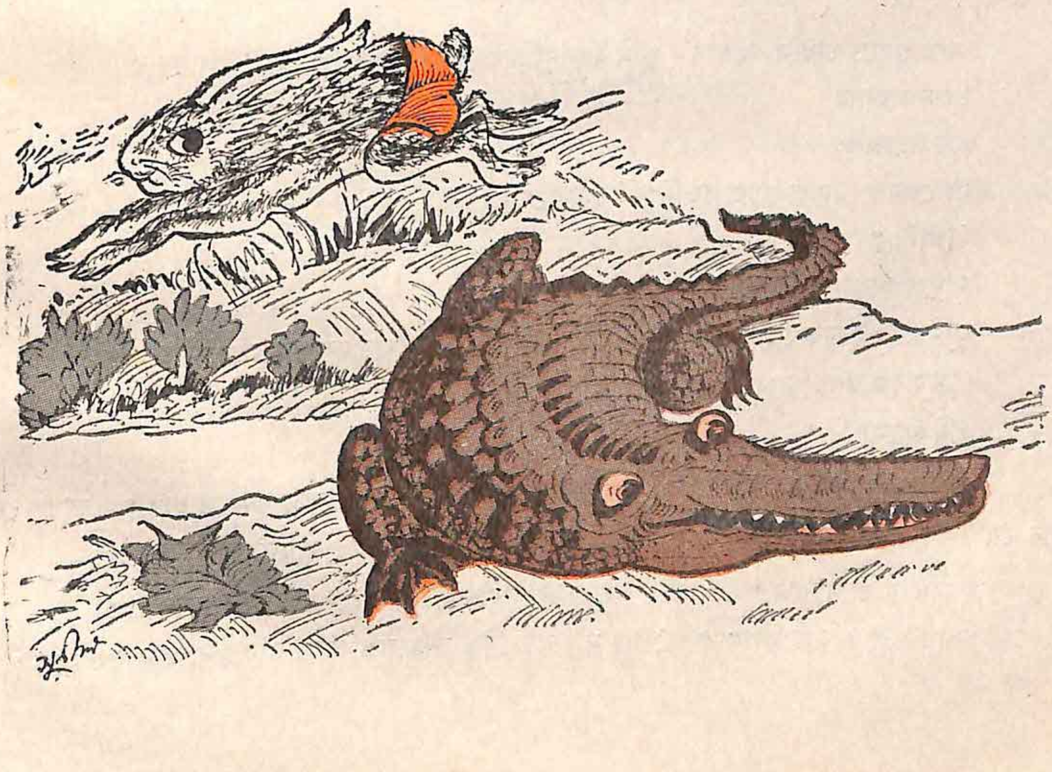
'কে ডাকে রে?' পিছন থেকে হঠাৎ এই আওয়াজ উঠল। রাজু চেয়ে ভাখে, মস্ত এক কুমির। লাফারু ততক্ষণে দিয়েছে চোঁচা দৌড়।

কুমির কেষ্টযাত্রার সুরে গাইল

দাদাগো দাদা পালাস না
তোর জন্যে আনব কেটে
সবরিকলার বাসনা।

দাদা যে ফিরে তাকান না
খিদেয় মোচড় দিচ্ছে পেটে
ঠেলে আসছে কান্না।

বাব্বাঃ, সে কান্না কি সহজে থামে? এক কলসি চোখের জল ঝরিয়ে তবে কান্না থামল কুমিরের। রাজু বলল, 'হুঁ, তুমি সেই টাকার কুমির।'



একেবারে নির্বিকার গলায় কুমির বলল 'নামটা উল্টে গেছে।'

'উল্টে গেছে মানে ?'

'মানেও পাল্টে গেছে।'

'আহা, খুলেই বলো না বাপু। অমন ধাঁধার মতো বলছ কেন ?'

'আমার নামের আগে টাকাটা কেটে কাঁটা করে দাও।'

'চন্দ্রবিন্দুটা কি ফালতু ? শুধু উল্টে গেছে বললে যে বড় ?'

'আমার বাপঠাকুর্দারা যশোরের লোক তো ? তাই চন্দ্রবিন্দুটা সব নাকেই থেকে যায়, কানে আর আসে না। তাছাড়া, নামের আগে চন্দ্রবিন্দুটা বড় কুলক্ষণ।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুমি কাঁটার কুমির কেন ?'

'আমি যে, মেছো কুমির। মাছ খাই, কাঁটাও খাই।'

'কেন, কোমরে টাকার পুটলি রাখা বুড়িকে খাও নি তুমি ?'

'খেয়েছিই তো। আমাকে অমন অকৃতজ্ঞ পাওনি যে খেয়ে বলব খাইনি। খেয়ে খাইনি বললে জানো তো আড়ংঘাটার বেড়াল হয়।'

'আড়ংঘাটার বেড়াল হয় মানে ?'

'ওই তোমার দোষ, জলপাইগাছের কেনো ভুতের মতো মানে জিজ্ঞেস করা। এবার জানতে চাইবে কেনো ভুতটি আবার কে ? তখন তোমাকে বগলাপিসির গল্প শোনাতে হবে। বগলাপিসির গল্প বলেই কি রেহাই পাব ? উড়নকপ্পুর নেত্যহরির জুতোচুরির মামলায় গেণ্টু গোঁসাইয়ের সেজ ছেলে বাহান্নকড়ি কী বলেছিল আর'

'আর শুনতে চাইনে, বাবা। তুমি বরং বুড়িকে খেয়ে কী করলে বল।'

'হজম করলাম।'

'এত সহজে ?'

'নয় কেন ? বুড়ি রোজ হজমিগুলি খেত যে।'

'টাকাটা ?'

'মানুষে টাকা হজম করে ফেলে, আমি পারব না ?'

'তুমি তো অনেক খোঁজ রাখো দেখছি', রাজু বলল, 'আমার ডলপুতুলের খোঁজ জানো ?'

'এত সহজ কথা আবার জানতে হয় ? বাচ্চারাও জানে।'

'তুমি জানো কি ?'

'বড় বেয়াদব মেয়ে তো তুমি ? যেটা বাচ্চারা জানে সেটা আমাকে জানতে হবে ? ছাগল যেটা জানে সেটা উটের জানার কি দরকার ? প্যাঁচা যেটা জানে পাঁচু সেটা আদৌ জানবে না।'

রাজু এ-যুক্তি মানতে পারল না। ও বলল, 'বাচ্চারা চলে বলে কি বড়রা চলে না ?'

'চলার সঙ্গে জানার তুলনা ? দেখছ না, কত কিছু জানলেও চলে আবার না জানলেও চলে ?'

রাজু রাগ করে বলল, ' তোমার সঙ্গে আমার কথা চলবে না।' পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে দিল। মনে মনে বলল, এদেশে একটাও মানুষ নেই।

বারো

'পিইটু'—ডাক শুনেই রাজু পাশে চাইল। আতাগাছের ওপর লেজ ঝুলিয়ে বসে পিটু আতা খাচ্ছে আর বিচি ছড়াচ্ছে। আশেপাশে চড়ুই শালিকরা কিচির মিচির করছে। রাজুর উড়ে যাওয়া টিয়ে পাখি এই পিটু।

পিটু সবাইকে হুঁশিয়ারি শোনাল

আতা খাচ্ছি বেশ করছি
ভাগ যদি চাস পাবি বিচির।
তলায় বসে হাঁ করে থাক
করবি নে-কো কিচির মিচির।
মাইক শুনে কানটা ভোঁতা.
দাঁতটা ভোঁতা শেকল কাটায়,
রাগলে বাপু জ্ঞান থাকে না
ভাঙব মাথা ডাঁটো আতায়।

রাজু মনে মনে বলল পিটুর তিরিক্ষে মেজাজটা দেখছি যায়নি। ডাকবে কিনা ইতস্তত করছিল। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ডালিমগাছে ফিঙে বসে আছে হাসি হাসি মুখ করে। গ্রামের সেজকাকাদের তলতা বাঁশের ছোট্ট ঝাড়টার ডগায় এই ফিঙেটাকেই দেখেছে মনে হচ্ছে।

রাজুর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল ঃ

আতা গাছে টিয়ে পাখি
ডালিম গাছে ফিঙে
না খেয়ে এক নাদুস নুদুস
আরেকটি টিঙটিঙে।

টিয়ে আর ফিঙে দুজনেই দু-ডাল থেকে হেঁকে উঠল

কখ্খনো না কখ্খনো না।

রাজু শুধোল ঃ কী খাও তবে পক্ক নোনা?



হুডাল থেকে পাল্টা প্রশ্ন ঃ

নয় কি খাব তোদের মতো
উচ্ছে পটল ঝিঙে ?

পেছন থেকে কে যেন ফোড়ন কাটল

তাই বা কেন, খাস আন্দসা
চাটনি দিয়ে ইদলি দোসা ;
কর গে খেয়ে ফুচকা আজ
গড়ের মাঠে কুচকাওয়াজ।

বেঁটে কুচ্ছিৎ চেহারা ; রাজুর চিনতে বাকি নেই, এ হোঁদলকুৎকুৎ। পিটু তো রেগে অগ্নিশর্মা। 'তুমি কে হে ?'—বলে হাঁক দিল।

ফিঙেও বলল, তবে একটু ভদ্র-ভাবে' 'কে বট আপনি ?'

রাজু একটা কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই হোঁদলকুৎকুৎ বলে উঠল, 'আমি খাইখাই সংঘের চেয়ারম্যান।'

রাজু জানত মিউনিসিপ্যালিটিরই শুধু চেয়ারম্যান হয়। কিন্তু এখানে সে-বস্তু আছে বলে রাজুর কখনো সন্দেহ হয়নি। কারণ হচ্ছে, এখানে জঞ্জাল নেই, রাস্তার ওপর নর্দমা উপচে পড়েনি, নষ্ট হয়ে থাকা টিউবোয়েল নেই পথে এখানে ওখানে।

পিটু ও ফিঙে উদাস গলায় বলল, 'চেয়ারের সম্পর্কে আমাদেরও কি আগ্রহ কম? তবে তোমার মতো চেয়ারা কই আমাদের ? তোমার ওই সেদ্ধ চায়ের পাতার মতো গায়ের রঙটি আমাদের নেই। তুমিই হচ্ছো চেয়ারে বসবার একমাত্র যোগ্য লোক, তাই বরং

আমরা দুজন বান্দা সরি,
খাও হে নবাব খান্দাসরি।'

বলেই ফুড়ৎ করে দুজনে পালাল দুদিকে।

রাজু এতক্ষণ নখ খুঁটছিল, আর তিনজনের কীর্তিকলাপ দেখছিল। নিজেকেই ধমক দিল সে, মা যেমন দেয়, 'বড় খারাপ স্বভাব হচ্ছে তোমার দিন দিন।'

'ঠিক বলেছ' হোঁদলকুৎকুৎ বলল 'স্বভাব পাল্টাতে হলে আমাদের সঙ্ঘের সভ্য হয়ে যাও। অল্প কয়েকটা নিয়ম-কানুন মানলেই তোমার অসভ্যতা কেটে যাবে।'

'আমার আবার নিয়ম-কানুন ভাঙতেই ভাল লাগে। কাঁচের গ্লাস চীনেমাটির কাপ-প্লেট—এসব ভাঙতেও আমি ওস্তাদ। এখানে আবার একদম কোনো নিয়ম নেই।'

'সে নিয়ম নয় হে' ভারিক্কি জবাব দিল হোঁদলকুৎকুৎ, 'আর একান্ত যদি ছাড়বেই না তো শোনো :

এটা খাই ওটা খাই
জল পেলে গোটা খাই
তা না পেলে লোটা খাই
আর খেলে খোঁটা খাই।

হাই পেলে তুলে খাই
ছোলা পেলে ছুলে খাই
ঢেলে খাই ঢুলে খাই
লেখাপড়া গুলে খাই।

পিঠে পেলে পেটে খাই
চুষে খাই চেটে খাই
খাটো কিসে—খেটে খাই
বুদ্ধিটা বেঁটে খাই।



হাড়ি দিলে বেড়ে খাই
তুলে দিলে পেড়ে খাই
মধু দিয়ে মেড়ে খাই
তা না দিলে কেড়ে খাই।

একা বসে ছুটি খাই
বসে বসে ছুটি খাই
এই মোটামুটি খাই
হেসে লুটোপুটি খাই।'

'বড় অদ্ভুত তো?'—রাজুর গলায় বিস্ময়।

'কারা? আমরা?' পাল্টা প্রশ্ন করে হোঁদলকুৎকুৎ। 'আমরা তো লুটোপুটি খাই। আর যারা লুটেপুটে খায় সেই বারোভুতের খবর রাখো?' রাজু ভাবছিল, মা প্রায়ই বাবাকে এই বারোভুতের কথা বলে। বাবার বিষয়সম্পত্তি নাকি এই বারোভুতেই লুটেপুটে খাচ্ছে। ওদের কথা একটু ভাববার চেষ্টা করতেই চোখটা বুঁজে এল।

তেরো

চোখ মেলতেই রাজু দেখল ভুতের মতো চেহারার কজন কাছেই গাছতলায় বসে জটলা করছে। যাক্, এরা আসল ভুত নয়। এখানে পাঁচটি ভুত দেখতে পাচ্ছে রাজু, আর সাতভুত বোধ হয় এই পঞ্চভুতে মিশে গেছে। সব যে শেষমেশ পঞ্চভূতেই মেশে একথা তো বইয়েই লেখা আছে।



একনম্বর ভুতের হাড়গিলে চেহারা। নাকটা ঝুলে পড়েছে অনেকটা। চোখেমুখে সবজান্তা ভাব। সে উঠে নাক ফুলিয়ে বলল

আমার কথার দর কি জানিস ?
সোনার চেয়ে আক্রা—
স্যাঁকরা দিয়ে বাঁধানো যে
কলম করা টাকরা ।

ইচ্ছেমতো কথার কথা
বলব হাজার একশ ।
আর যদি তুই একটা বলিস
বসিয়ে দেব ট্যাক্সো ।

দুনম্বর উঠে একটু হামবড়া ভাব নিয়ে বলতে লাগল

ভাবছ বুঝি বড্ড সোজা
দুধের থেকে সর করা,
লাগবে দুমণ কাজুবাদাম
আর কেজি চার শর্করা ।

ধীরে সুস্থে দাম ফেলো তার
পাক্কা বারোবার কষে ;
টাকার গরম জুড়িয়ে গেলে
বরফি কাটো বারকোষে ।

তিননম্বর ভুতের পরনে লুঙি । বেঁটে খাটো মজবুত চেহারা । সব সময় হাসি হাসি মুখ ।— সে জানাল

বিশ্বসুদ্ধ সবাই আমার
আপনতুত গাঁয়ের তুত ।
সবার কাছে একটি বারও
যেতেই ছেঁড়ে পায়ের সুতো ।

খোরাক বাঁচে, জুড়লে সুতো
লম্বা হবে কম ভেবো না,
ধুতি একখান নাও যদি হয়
গামছা লুঙি হবেই বোনা ।

চারনম্বর ভুতের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি । মাথায় ইস্কুপের মতো প্যাঁচানো চুল । চোখ কুঁৎ কুঁৎ করে, বেশ মিহি গলায় বলল

টাকা করার সহজ উপায়
বের করেছি ওষ্ঠ পিষে—

হ্যাঙ্গামা নেই টাকা রাখার
ব্যাঙ্ক অথবা পোষ্টপিসে।
চর মারফৎ যখনই পাই
খবর দুজন ঠোঁটকাটার
অমনি ধরে পিষতে থাকি
সরুর সঙ্গে মোটকাটার।

এইবার পঞ্চম ভুতের পালা। গাট্টাগোট্টা চেহারা, ভোজপুরী দারোয়ানের মত গোঁফ, কিন্তু চুল বাবরি করা। চিঁ-চিঁ করা গলায় শুরু করল

আমি হলাম একাধারে
বিপ্লবী ও কালোয়াত,
তাই খেয়ালে ভাঙছি আমি
রাগ রাগিণীর কালো হাত।
আর বাকিটা ভাঙে আমার
তবলচি—সেও পালোয়ান ;
চক্ষে যখন আঁধার দেখি
হাঁকতে থাকি, আলো আন।

রাজু আশ্বস্ত হল, ভাগ্যিস আর সাতজন নেই। হতভম্ব ভাবটা কেটে গেলে রাজু হন্ হন্ করে পা চালাল। রাজবাড়ি আর কতদূর কে জানে ?

চোদ্দো

যেতে যেতে দুটো তালগাছ পার হয়ে আরেকটা তালগাছের তলায় আসতেই হাঁক শুনল, 'কে রে ?'

খুব উঁচু নয় গাছটা, তার ওপর বাজ পড়ে মাথাটা সমান। ওই মাথায় বসে কাকাতুয়া তার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। চোখে চশমার একটা ফ্রেম শুধু, কাঁচ নেই।

রাজু জবাব দিল, 'আমি।'

রাজুকে দেখে কাকাতুয়ার গুরুগিরি জেগে উঠল, জিজ্ঞেস করল

ভুতের বাপের ছেরাদ্দ
বলতো দেখি কে রাঁধত ?

রাজু হার মানার পাত্র নয়, জবাব দেয়

কেন তোমার ঠাকুর্দা না ?
ফোড়ন দিত কাঁকুড়দানা।



গানের সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে কাকাতুয়া বলে উঠল, 'ওয়াঃ ওয়াঃ।' নৃপেনমামার বড় ছেলে ভজাদা কালোয়াতি গান শুনে ঠিক এইরকম করে। সঙ্গে সঙ্গে রাজুর খেয়াল হল—আরে, এ সেই নৃপেনমামাদের বুড়ো কাকাতুয়া মদনা।

চেনা একজনকে পেয়ে রাজু আলাপ করতে চাইল, 'আরে মদনা যে, তুই এখানে কী মনে করে ?'

'কী মদনা মদনা করছিস ? আমি এখানে শ্রীমদন খুল্লতোতা। সাকিন তালগাছের ডগা।'

কাকাতুয়া শব্দটাকে বেটা 'খুল্লতোতা' বানিয়েছে। ন-কাকার মতো করে রাজু বলল, 'ব্রেশ ব্রেশ। এখানে তোমার কেমন লাগছে মদনবাবু ?'

কাকাতুয়া ভয়ানক খুশি হল। নৃপেনমামা ওকে মদনবাবু বলেই আদর করতেন।

রাজু বলল, 'তুমি তো এখানকার সবই জানো আর তালগাছের ডগায় থাকো বলে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখতেও পাও। বলতে পারো আমার ডলপুতুলটা কোথায় ?'

'সেইটেই তো বের করতে হবে। তার আগে তোকে যা যা প্রশ্ন করি তার ঠিক ঠিক উত্তর দে' বলে চশমার ফ্রেমটা ওপরে ঠেলে দিল। মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলার সময় নৃপেনমামা ঠিক এইরকম করেন। ডুবুরিদের মতো দেখায় তাঁকে সে সময়। এই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিল কাকাতুয়া, 'সংক্ষেপে বলবি, আরো অনেক মক্কেল আছে। বলতে সুরু করলে তোদের আবার আক্কেল থাকে না।'

রাজু ঘাড় কাত করল।

'বল্ এইবার ক'টা বেজে ক-মিনিটে শেষ পুতুলটাকে দেখেছিস ?'

'দুপুরবেলায়।'

'অ। সঙ্গে আর কেউ ছিল ? এই ধর্, কোনো ইঁদুর, কি কাক, কিংবা ওপাড়ার শৈল ?'

'সঙ্গে আমিই ছিলাম। আমারই হাতে ছিল ওটা।'

'হাত ঘেমেছিল তোর?'

রাজু মাথা নাড়ল।

বিজ্ঞের মতো বলে কাকাতুয়া, 'জানতাম, ঘামবে না। এসব নিয়ে কি তুই কোনদিন মাথা ঘামিয়েছিস যে হাত ঘামবে? ঠিক কোন্ সময় বলতে পারছিস নে, সঙ্গে কেউ ছিল না বলছিস, আবার বলছিস হাতও ঘামে নি। তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? সাধারণত দেখা যায় জিনিস বড় একটা হারায় না। খোয়া যেতে পারে। আবার খোয়াও যে খুব বেশি যায়, তাও বলা চলে না। আর সব কিছুই যে বলা চলে তারই বা ঠিক কী। ঠিক হলে তো সাক্ষীই থাকত। আর সাক্ষী থাকলে তোকে জেরা করব কেন, সাক্ষীকেই বরং'

উঃ, আর শুনলে মাথা ধরে যেতে পারে—মনে করে রাজু পা চালাল।

কাকাতুয়া ডাকছিল পেছন থেকে 'আরে শোন শোন।'

পনেরো

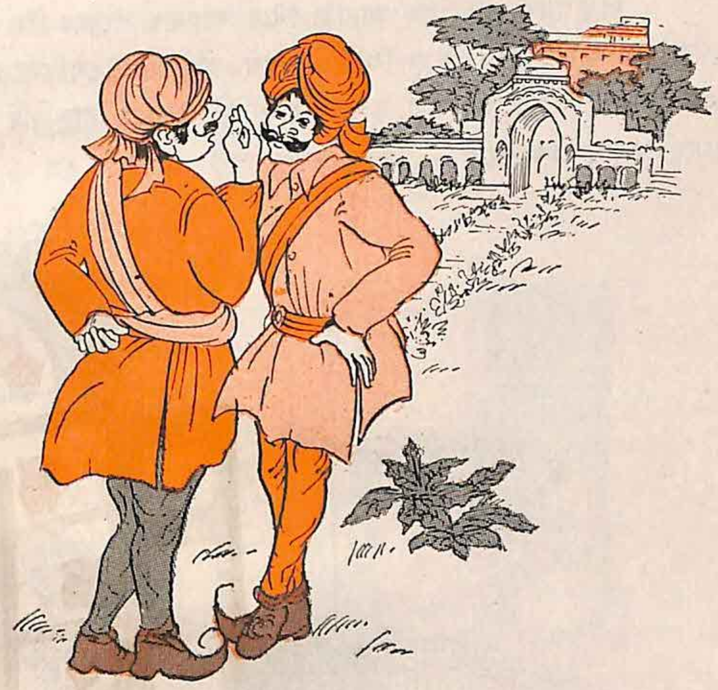
দূর থেকেই রাজবাড়ির দেউড়ি দেখা যাচ্ছিল। দেউড়ির মাথায় একটা বিশাল সাইনবোর্ড, তাতে বিরাট একটা লুডোর কোট আঁকা। তার তলায় বড় বড় হরফে কী যেন লেখা। দূর থেকে লেখাটা পড়া যাচ্ছিল না। একটু কাছে আসতেই রাজু পড়ল ঃ

ফক্কারাজার অক্কাগড়ে
যখন তখন ছক্কা পড়ে।

বড় তাজ্জব ব্যাপার। এ ছড়াটা এরা জানল কী করে? তলায় ডানদিকে ছোট্ট করে লেখাও আছে 'রাজু'। নিজের নাম দেখে আরো অবাক হয় রাজু। এরা শুধু ওর ছড়াটাই চুরি করে নি, নামটাও চুরি করেছে। তা হলে কী ওর নামটাও নেই? মানতেই হবে ওটা খোয়া গেছে। এখন উপায়? কী নামে ডাকলে ও এখন সাড়া দেবে?

দারুণ সমস্যায় পড়ে ভাবতে ভাবতে দেউড়ির একেবারে সামনে এসে পড়ল। দেউড়ির দুপাশ থেকে দুই নিধিরামসর্দার হাঁটতে হাঁটতে ঠিক মাঝখানে এসে এ ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াচ্ছে। তারপর নিজের নিজের ডানপাশে মাথা হেলিয়ে পানের পিক ফেলে আবার দুই পাশে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছুঁড়ে কালোয়াতি গান গেয়ে চলেছে। এ আবার কী রকম পাহারা দেওয়া! রাজু ভাবল, একটু আলাপ করে খোঁজ খবর নিলে ক্ষতি কী? অনেকক্ষণ কথা বলতে না পেরে রাজুর পেট ফুলছিল। ভাগ্যিস জোরে বলে নি কথাটা নইলে সত্যিই পেট ফুলতে শুরু করত। নিজের ভাষার ওপরেই ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল রাজুর।

দুজনে মাঝখানে এসে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যেই মাথা হেলাতে যাবে অমনি রাজু চেঁচিয়ে বলল ঃ



নেই ঢাল
তরোয়াল
নিধিরাম সর্দার,
গান ভাঁজে
খাম্বাজে
পিক ফেলে জর্দার।

যেমন ছিল তেমনই রইল ওরা, নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু।

কী মুশকিল ! এ কি মন্তর পড়লাম নাকি আমি ?—রাজু বিব্রত হয়ে ডাকল 'নিধুদা।'

দুজনে ধুপ করে বসে পড়ল এবার।

এখানে নাম ধরে ডাকলে এরকম ধুপ করে বসে পড়ে নাকি ? যাকগে আমার তো নাম চুরি গেছে। আমার আর কোনো ভয় নেই। ভাবতে ভাবতে রাজু দেউড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল।

নানারকম ফুলফল ঝরণা দেখতে দেখতে রাজু এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। 'মনে হচ্ছে রাজবাড়ির খিড়কির দিকে হাজির হয়েছি। তা ভালই হল'—রাজু ভাবল। রানী না হোক দাসীবাঁদীদের কাউকে দেখতে পেলে খোঁজখবরটা নেওয়া যাবে। আর রাজবাড়ির মালিনীর সঙ্গে যদি দেখা হয় ? তা হলে তো কথাই নেই। অন্দরমহলের সব খবর সে রাখে। কার কবে জন্মদিন। কোন্ রাজপুত্তুর হামাগুড়ি দিতে গিয়ে পড়ে নাক ফাটিয়েছে—সবই।

'যাচ্ছে ফুলের ডালি নিয়ে,
ঠিক বুঝেছি মালিনী এ'

এই পদ্যটা মনে মনে বাঁধা হতেই রাজু সামনে দেখে হীরে মালিনী। রাজু জোর পায়ে হেঁটে কাছে গিয়ে ডাকল, 'হীরেদিদি ও হীরেদিদি।'

'ও তুই'—পেছন ফিরে জবাব দিল হীরে মালিনী, যেন কতকালকার চেনা আপনজন। 'চল্ তোকে রাণীমার কাছে নিয়ে যাই। লক্ষ্মী রানীমা আমাদের।'

মালিনীর পেছন পেছন রাজবাড়িতে ঢুকল রাজু। ওরা যেতেই রানী বেরিয়ে এল। 'আয়, ঘরে আয়' বলে হাত ধরে নিয়ে গেল এক বড় হলঘরে। 'তুই এই আসনটায় বস', এই বলে একটা ময়ূরতোলা

আসন দেখিয়ে দিল। 'দেখে আসি রাজার কোমরবন্ধ আঁটা কদ্দুর হল।' বেরিয়ে গেল তক্ষুণি। হলঘরের বড় আয়নার দিকে চোখ পড়ল রাজুর। ইস্, এই খাটো বাজে জামাটা পরে রাজবাড়িতে ঢুকতে হল।

রাজু যখন তার বাজে জামাটা নিয়ে ভাবনায় পড়েছে ঠিক সেই সময় পেছনে কলকল শব্দ শোনা গেল কচি-কচি গলায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একটা ছোট শো-কেসে কত পুতুল সাজানো। সবই প্রায় ওর চেনা। ওরা সোরগোল তুলল 'রাজুদিদি এসেছে, রাজুদিদি এসেছে' কয়েকজন তো লাফিয়ে নেমেই পড়ল তাক থেকে। রাজুকে ওদের দিকে ঘুরে বসতে হল।



'একটা গল্প বলো' ঠ্যাং-ভাঙা ঘোড়াটা আব্দার ধরল।

'কী গল্প শুনবি বল', রাজু জিজ্ঞেস করল, 'শেয়ালরাজার বিয়ের গল্প ? না, ওটা অনেক লম্বা। রাজসভা থেকে ফিরে এসে বরং শোনাব। এখন মামীর ওল রান্নার গল্পটা বলছি, শোন।' ঘোড়াটা উঁ উঁ করে ঘ্যানাতে থাকল তবু। রাজু বলল, 'আগে শোন্‌ই না—

ওলের ডালনা রাঁধতে বসে
ঘুমিয়ে পড়েন মামী ;
পোড়া গন্ধে কাঁদেন মামা
ওলটা ছিল দামী।

চটকা ভেঙে মামী রেগে
বলেন, কী ছাই রাঁধব জেগে ;
ঘুম এলো তাই দেখতে পেলাম
স্বপ্নে কত রান্না।
একটু তো ছাই ওল পুড়েছে
তাতেই এত কান্না ?
সুক্তো রাঁধো মুক্তোদানায়
গুঁড়ো হীরের ছুধের ছানায়
মালপো ভেজে দাও ছিটিয়ে
পেষাই করা পান্না।
চণ্ডীগড়ের মহারাজাও
এমন খানা খান না।



ওলের ওপর তোমার দরদ
তা জানি নে আমি ?
ওলের শোকে কাঁদেন মামা,
ঘুমের শোকে মামী।'

শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল, 'আরেকখানা আরেকখানা।' রাজু কিন্তু ভাবছিল, রাজা এখন কী করছেন ? রানী ফিরে এসে জানাল, 'রাজা এখন গোঁফ ছুরস্ত করছেন। যাই তাড়া দিই গে।' রানী আবার বেরিয়ে গেল।

'রাজুদিদি', নাকভোঁতা নাড়ুগোপালটি আব্দার ধরল, 'আরেকটা বলো।'

'কোন্‌টা শুনবি, চাকদার মামার আমপাড়ার গল্প, না, গোবর্ধন সায়েবের গল্প ?'

'গোবর্ধন সায়েবের গল্পই বলো।'

'বাঁচালি। চাকদার মামার গল্পটা ভালো ঠিকই, তবে তোরা তো খুবই ছোট, ভালো বুঝবি নে। নে, এইবার মন দিয়ে শোন—



পাক্কা সাহেব গোবর্ধন
আতরজলে গোবর ধোন।
তখন সেটা চোদ্দবার
নিংড়ে করেন পত্ত বার।
ছন্দটা তার সাতরকম,
দু একখানা মাত্র কম।
শিখতে গেলেন ডিব্রুগড়—
গুরু বললে, হিব্রু পড়।
মনের কষ্টে বাংলা পান
চিবোন এবং ব্যাঙ লাফান।'

শেষ করে রাজু আবার ভাবছিল, রাজা এখন কী করছেন ?
রানী ফিরে এসে বলল, 'রাজা এবার ভুরু কোঁচকাচ্ছেন, যাই তাড়া দিই গে।'
'রাজুদিদি' লেজকাটা হনুমানটা বলে উঠল, 'আর একটা গল্প বলো ততক্ষণ।'
'ছক্কুমিয়ার ছেলেমেয়েদের গল্প শুনবি ?'
'হ্যাঁ শুনব'—সবাই একসঙ্গে বলল।
'তবে শোন



একটি ছেলে ছক্কুমিয়ার
মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার ;
দশটি বছর রুড়কি
শিখতে গেল কেমন করে
ভাঙায় খোয়ার সুড়কি।

মাথাটা সাফ আর এক ছেলের
কুকার রান্নায় রেড়ির তেলের।

সবার ছোট বুড়কী
খই ছুটিয়ে মুখের কথায়
বানায় মোয়া মুড়কি।'

এইভাবে রাজু এক একটা গল্প বলে আর ভাবতে বসে, রাজা এখন কী করছেন ? আর রানী এসে খবর দেয় 'রাজা অমুকটা করছেন কি তমুকটা করছেন।' আবার রাজাকে তাড়া দিতে চলে যায়।

গল্প বলতে বলতে রাজুর মুখে ফেনা উঠে গেল তবু রাজার সাজগোজ আর হয় না। রাজু মনে মনে বলল 'দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।' একটা ডাঁটি-ভাঙা চীনেমাটির কাপ নিয়ে মন্ত্রের সুরে রাজু আওড়াল

এখন যে-লোক নিচ্ছে মেকাপ,
দোহাই তোমার হে চীনে কাপ,
চোঁ করে তার মাথার ওপর
আটকে বসে হও গে টোপর ;
যতক্ষণ না যাচ্ছে সভায়
ঘা মারো তার ডাইনে ও বাঁয় ।

রানী এসে খবর দিল, 'রাজার টোপর পরা হয়ে গেছে, এবার সভায় যাচ্ছেন। চলো আমরাও যাই।'

যেতে যেতে রানীর কানে ফিসফিস করে রাজু তার আরজি রাখল, 'রাজাকে বলতে ভুলো না যেন আমার ডলপুতুলের কথাটা।'

ষোলো

সভায় রাজা সিংহাসনে বসেছে। পাশে রানী। মন্ত্রী সভাসদ্ পাত্রমিত্র ঠিক তার পরের সারিগুলোয়। যেমন যেমন রাজসভায় হয়ে থাকে, অবিকল সেইরকম।



নকীব হাঁকল—শ্রীল শ্রীযুক্ত এক হাজার তিনশ বাহান্ন শ্রী রাজাবাহাদুর তাঁর স্বরচিৎ গদ্য পাঠ করবে এ এ এ এ ন।

রাজা দাঁড়িয়ে উঠে দড়ির মতো পাকানো একখানা কাগজ নিয়ে পাঠ করতে লাগল : 'কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এবং শুনেনও বটে আমার বয়স হইয়াছে এবং বায়সেরাও তথাপি'

রাজু কান খাড়া করে শুনছিল আর ভাবছিল, মানুষ যেভাবে কথা বলে সেভাবে নিশ্চয়ই গদ্য হয় না। রাজা বেশ কষ্ট করে বানিয়েছে গদ্যটা।

একটা অনুচ্ছেদ শেষ করে রাজা যখন আরম্ভ করতে যাবে এমন সময় একজন আধবুড়ো উঠে হাতজোড় করে দাঁড়াল। পোশাক-আসাক একটু সেকেলে, কিন্তু একালের ছেলেদের মত বেশ মোটা জুলপি ও চুল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, 'হুজুর !

হেথায় এনু আরজি নিয়া
তামাকু চাই ভারজিনিয়া।'

রাজা প্রথমে একটা তুড়ি মারল, তারপর বিকট শব্দ করে হাই তুলল একটা। লোকটা গুটিগুটি সরে পড়লে রাজা শুরু করল আবার।

'এবং পুরঃসর গর্দান যাইবেক, তত্রাচ কাল হলধর পটল ভাজার সঙ্গে ভালো মুগের ডাল এবং যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং বাঁধ ভেঙে দাও হে ভৃঙ্গরাজ, ডবলরিফাইণ্ড তৈল এবং কেন হৈল কানে খৈল'

'ঠিক আমার চিঠির মতো'—রাজু মনে মনে বলল, 'তাতেও অনেক "এবং" থাকে। আমার চিঠি পড়ে বাবা যেমন হাসে রাজার গদ্য শুনে আমারও তেমন হাসি পাচ্ছে। বড্ড সোজা সোজা শব্দ লাগিয়েছে !'

এমন সময় সভার ডানদিকে দেখা গেল বেশ হৃষ্টপুষ্ট একদল 'গদ্য চাইনে, খাদ্য চাই' বলে চেঁচাচ্ছে।

রাজু ভাবল, দেখে তো মনে হয় না এদের খাবারের অভাব আছে। এরা আবার কেমন ভিখিরি ? পাশে বসে আছে সজারু গায়ের কাঁটা ফুলিয়ে। তাকেই চাপা গলায় শুধোল, 'এখানেও ভিখিরি আছে ?'

'থাকবে না ? ভাবো কি আমাদের দেশ অসভ্য ?'

'আমার ধারণা ছিল এখানে সবাই খেতে পায়।'

সজারু গা ঝাড়া দিয়ে ঝমঝম করে আওয়াজ করল কাঁটায়। একটু ঝেঁজেই বলল, 'পায়ই তো। তবে প্রথমেই কি পায় ? চাইতে হয়। চেয়েছিলে বলেই তো তুমি জুতো পেয়েছিলে। তাও, চেয়েছিলে কমলা রঙের জুতো, পেলে কালো জুতো।'

রাজু লক্ষ্য করল রানী উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে রাজাকে বলছে রানী :

এতই যদি ভিক্ষাভাব
খেলেই পারে শিককাবাব।
করতে হলে সর্ষে-ঝাল
আদা মৌরি দিক ভেজাল।

শক্ত হলে ঝোল মাখাক,
কিম্বা ভেজে দোলমা খাক ;
এতেই খিদে নষ্ট হলে
বাড়াক খিদে দশ টহলে ;
আর যদি হয় ঘাম প্রচুর,
জোলাপ খাবে আম্রচুর।
এই যে অভাব ভাতরুটির
ফলটা বলো কার ত্রুটির ?

রাজু ভেবেছিল রাজা হয়তো তুড়ি মেরে হাই তুলে ভিখিরিদের তাড়িয়ে দেবে। তা হল না। রাজা আদেশ দিল 'যাও, ওদের শিককাবাব খাইয়ে দাও।'

রাজুও একবার ভাবল, যাই ওদের পেছনে পেছনে শিককাবাব খেয়ে আসি গে। কিন্তু খটকা লাগল, কই আর কেউ তো ভিখিরিদের সঙ্গে গেল না ? হয় এদেশের শিককাবাবটা তেমন সুস্বাদু নয়, আর না হলে, যারা চাই চাই করে তারাই শুধু খেতে পায়।

সজারু ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে—'বললাম না ? এখানে সবাই খেতে পায় তবু আমরা ভিখিরি রেখে দিয়েছি। ওরা না থাকলে ভিক্ষে, ভিখিরি, দুর্ভিক্ষ, অনাহার—কতগুলো দামী দামী কথা উঠে যেত অভিধান থেকে। ভাষাটা ছোট হয়ে যেত না ?'

রাজুকে মানতে হল।

সজারু আরো বলল; 'শব্দ আছে মানে নেই, মানে আছে শব্দ নেই—এ দেশে তা চলে না বাপু।'

'তোমাদের সভায়ও গণ্ডগোল হয় ?' সজারুকে আবার জিজ্ঞেস করল রাজু।

'হবেই তো। সভা হলেই গণ্ডগোলও হবে। গণ্ডগোল হচ্ছে অথচ সভা হচ্ছে না এ যেমন ভাবা যায় না, তেমনি সভা হচ্ছে কিন্তু গণ্ডগোল নেই এটা গণ্ডমূর্খরাও ভাবে না। এখানে গণ্ডগোল করার জন্যে মাইনে করা লোক আছে রীতিমতো।'

'ও, তাই বুঝি'—মুখে বলল, কিন্তু মনে মনে বলল, 'দাঁড়াও গণ্ডগোল কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

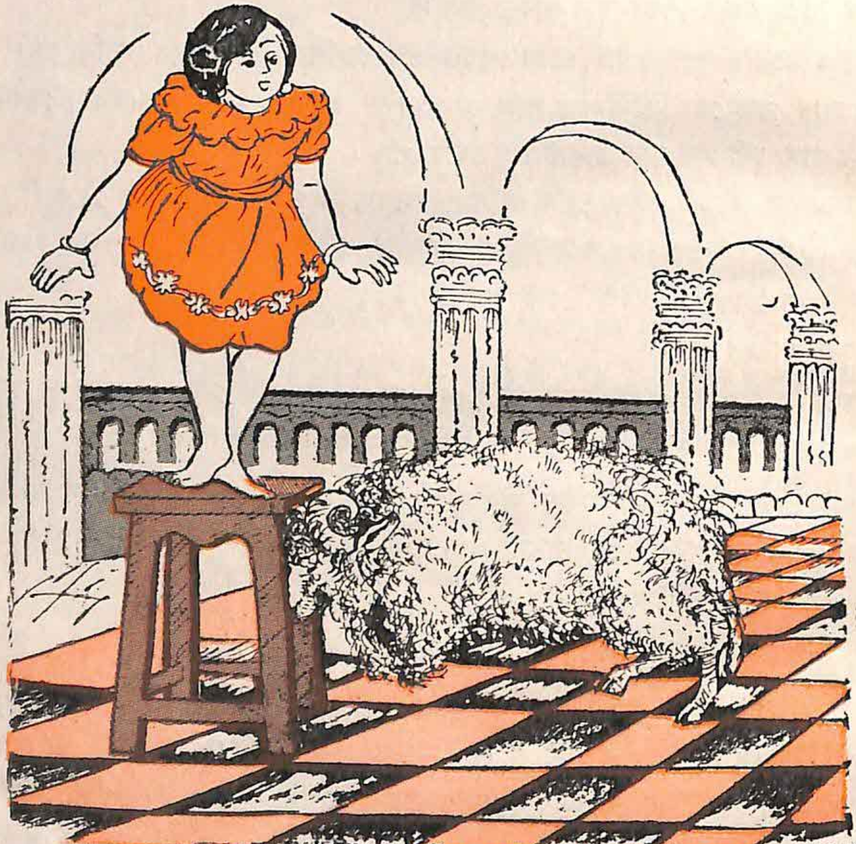
রাজা আবেগ দিয়ে গদ্যপাঠ করছিল 'এবং তাহারা বিনিময় করায়'—। এ জায়গাটা রাজুর খটোমটো লাগছিল খুব। হঠাৎ দুর্বুদ্ধি চাপল মাথায়। চোখ বুঁজে পা গুণে গুণে রাজার পাশে গিয়ে আচ্ছাসে কান মলে দিল রাজার। ব্যথার চোটে রাজার হাত থেকে দড়ির মতো পাকানো কাগজটা—যার কয়েক প্যাঁচ মাত্র খোলা হয়েছে—সেটা খসে পড়ল। চোখ-বোঁজা রাজুকে দেখতে না পেয়ে রাজা ঠাস করে চড় মারল রানীর গালে। রানী কিল মারল তার পাশের কিঙ্করীর পিঠে—সে চামর ঢোলাচ্ছিল। চামর ফেলে সে এক সভাসদের পেটে মারল লাথি। তারপর যে যাকে কাছে পেল কিল ঘুসি মারল। সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার!

ইতিমধ্যে রাজু চোখ বুঁজেই সরে পড়েছে এক ফাঁকা জায়গায়।

সব শান্ত হয়ে যাবার পর রাজা যেই 'এবং' দিয়ে গদ্যপাঠ শুরু করেছে অমনি রাজু আবার চোখ বুঁজে ছড়া কাটল :

গদ্য যে পড়ে স্বরচিৎ
ঠ্যাং ধরে তাকে করো চিৎ।
নয় তো বকবে এখানেই
আজে বাজে যেটা লেখা নেই।
ব্যাগ্‌গাতা করি পরমেশ
এক্ষুণি ওকে করো মেষ।

সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। সব ছাপিয়ে রানীর ভেউ ভেউ কান্না কানে এল। রাজু চোখ খুলে ছ্যাখে মঞ্চের ওপর রাজা নেই। তার বদলে একটা ভেড়া যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই



গুঁতোচ্ছে। সবাই যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। রাজু টপ করে লাফিয়ে একটা টুলের ওপর উঠল। ভেড়াটা টুলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে মারল এক ঢুঁ। রাজু ছিটকে ওপরে উঠতেই চোখ বুঁজে ফেলল আবার। চোখ বুঁজে আছি তবু আমার চুলের মুঠি ধরে টানছে কে ?—রাজু ভাবল।

সতেরো

ধড়ফড় করে উঠে বসল রাজু। ইস্, বেলা যে একেবারে গেছে। বালিসের ওপর পড়ন্ত রোদের ফালি এসে পড়েছে জানলা আর পাশের নারকেলগাছটা চুঁইয়ে। মনে হচ্ছিল ওটাও ওর পাশে শুয়ে ছিল এতক্ষণ। বাইরে একটা দোয়েল ডাকছে একটানা—টিক টিকৌ টিক্কু টু। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল রাজু। না, দেখা যাচ্ছে না দোয়েলটাকে। আছে কোন আমগাছের মগডালে। লেজটা নিশ্চয় আস্তে আস্তে তুলছে আবার নামাচ্ছে।

রাজু এখনো ঠিক বুঝতে পারছে না কোন্ দেশটা বেশি ভালো। তবে এদেশটা আগের চেয়ে সুন্দর লাগতে শুরু করেছে। নন্দকাকা ঠিক সময়ে না এসে পড়লে ওই দেশেই থাকতে হত চিরকাল, মা এই কথা বলেছে। কাপড়ে জলের হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল মা, বলল—'ফের যদি আঘাটায় নামবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে ছাড়ব।' নন্দকাকাও ঢুকল সেই সময়। বলল 'আর বোকো না বউদি।' একটা রঙচঙা বই বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ছোটমামা তোর জন্যে এই ছড়ার বইটা পাঠিয়েছে মেহেরালির হাত দিয়ে।

বইটা উল্টেপাল্টে রাজুর মনে হল সব ছড়াই ওর জানা। এখানেও কি সবাই ওর ছড়া চুরি করছে? মুচকি হাসি ফুটল রাজুর মুখে।

ডলপুতুলের দিকে চোখ পড়ল এবার। 'কী রে ডলি, মুখ ভার করে আছিস যে? ও বুঝেছি, তুইও একটা গল্প শুনতে চাস। ভাবলি, ওই খাঁদা বঁুচিদের কত গল্প শোনালাম আর তোর বেলায় লবডঙ্কা? আরে না। আরো একটা বানিয়েছি ওখানে থাকতেই। চুপি চুপি বলি ফক্কারাজার নক্কীরানীর গল্প। শুধু তোকে শোনাব বলেই রেখে দিয়েছি। সবুর কর, আগে একটা কাজ সেরে নিই। রাজাটাকে যে ভেড়া বানিয়ে এসেছি, মনে নেই? রানীর যে খুব কষ্ট।' যেমনভাবে মন্ত্র পড়ে তেমন ভাবভঙ্গী করে রাজু আওড়াল:

'ঢ্যাড়া গোল্লা গোল্লা ঢ্যাড়া
রূপ ফিরে পাক আসল ভেড়া।
শেষ হয়েছে তোমার সাজা
হও হে আবার ফক্কারাজা।
ডলির বিয়ে আসছে মাঘে,
খবর দিলাম আগেভাগে।
মুখ দেখো না নোলক দিয়ে,
দেয় নি যে কেউ নাক বিঁধিয়ে।

বিয়ের কথা শুনে খুব মজা পাচ্ছে, তাই না? কিন্তু ফক্কারাজা যদি সত্যিই নোলক আনে তো নাক বেঁধাতেই হবে। ভয় কী, ডাক্তারবাবু খুব সুন্দর বিঁধোন, একটুও লাগে না। আচ্ছা, এবার নক্কীরানীর কথা শোন। ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন। ডেকে খাওয়াতে পারব না বাপু।

ফক্কারাজার নক্কীরানীর
বাপের বংশ বড্ড মানীর।
মামারা সব কুঁড়ের নবাব,
হাজার ডাকেও দেয় না জবাব।
পান আসছে ডাবর ডাবর,
চিবোচ্ছে আর কাটছে জাবর।
পায়ের কাছে কুকুর মেকুর
তুলছে মোটা মিহি ঢেকুর।
নিজের জন্যে ল্যাংচা রাখেন,
খানপঞ্চাশ খান না, চাখেন।
রাজার জন্যে করেন তয়ের
শক্ত গজা খাট্টা দইয়ের ;
কিন্তু রাজার এমন বরাত—
ধার-পড়া সব দাঁতের করাত।
দেখ যদি তুই ছিঁড়তে পারিস,
করব কি তোর নাম সুপারিস ?

শুনেই নাল পড়ছে মুখ দিয়ে? হ্যাংলা কোথাকার।' পুতুলটা মুখের কাছে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'এই ছড়াটা শুধু তোর আর আমার। এটা কেউ চুরি করে নি এখনও।'